পাহাড়ের

সত্যেন সেন

568-70

সাতমহল

পাগলাঘোড়ার

সত্যেন সেন

প্রকাশক :

এম. আবদুল হক

প্রকাশ-ভবন

৪, বাংলা বাজার, ঢাকা—১

মুদ্রণ :

এম. রহমান

সরকার প্রিন্টার্স

৪১/২, ইসলামপুর, ঢাকা—১

প্রচ্ছদপট :

হাসেম খান

প্রথম প্রকাশ :

মার্চ—১৯৭০

দাম :

তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

স্নেহের মণিলাকে

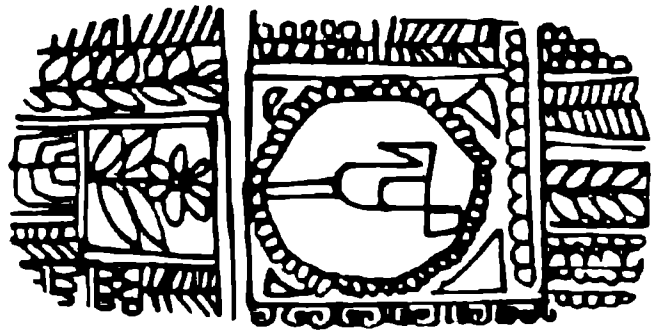

সূচীপত্র

অনেক দূরের দেশ	১
মানুষের মত বাঁচতে চাই	৬
চালতা গাছের মাচা	১৪
ডাকু	২২
চোর	২৭
শক্তের ভক্ত	৩২
ভাই ভাই	৩৮
এটম বোম	৪৫
বনবাসে	৫০
তোরা সবাই সুখে থাক	৬২
মামা-ভাগনের কাহিনী	৭০
টিয়া পাখীর বাচ্চা	৭৫
ভালুকের মা	৮২
লাল গরুটা	৯২
ভুলো আর রংগী	৯৬
নেকড়ে বাঘের বাচ্চা	১০৫
আহম্মকের দেশে	১১৪
মুরগীর ছানা	১১৯
টেপীর কাণ্ড	১২৩

এই লেখকের অন্যান্য বই :

উপন্যাস :

আলবেরুনী

পাপের সন্তান

অভিশপ্ত নগরী

রুদ্ধদ্বার মুক্ত প্রাণ

পদচিহ্ন

সেয়ানা

পুরুষমেধ

কুমার জীব

বিদ্রোহী কৈবর্ত

৭নং ওয়ার্ড

ইত্যাদি ।

অন্যান্য বই :

মহাবিদ্রোহের কাহিনী

গ্রাম বাংলার পথে পথে

মসলার যুদ্ধ

অভিযাত্রী

বিকিরণ

আইসোটোপ

আমাদের এই পৃথিবী

ইত্যাদি ।

অনেক দূরের দেশে

বাতাস ছুটে যাচ্ছিল বোঁ বোঁ বোঁ শন্ শন্ শন্—

খুকু বলল, বাতাস, ও বাতাস, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি তোমার সংগে যাব।

বাতাস বলল, উহুঃ, আমার একটুও দাঁড়াবার সময় নেই, আমার কত কাজ।

কি তোমার এত কাজ বল না?

কি কাজ? কাজের কি আর অন্ত আছে? ঐ যে মেঘগুলো দেখছ না—সাদা সাদা মেঘগুলো? আমি ওদের বয়ে নিয়ে যাব, অনেক দূরে, অনেক দূরের দেশে।

কেন, ওদের নিয়ে যাবে কেন? ওরা কি করবে? কোন দূরের দেশে গো?

অনেক দূরের দেশে, যেখানে বিষ্টি হয় না, ঘাস গজায় না, ফসল ফলে না, ফুল ফোটে না, আয় বিষ্টি আয় বিষ্টি বলে সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে—ওরা যাবে সেই দেশে। তার পর সেখানে গিয়ে আগে ফোঁটায় ফোঁটায় বিষ্টি নামবে। শেষে ঝুপ ঝুপিয়ে নামবে। সে দেশের ছেলে মেয়েরা হাত তালি দিয়ে নাচবে আর গাইবে,

আয় বিষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে।
হে বিষ্টি ঝরে যা
নেবুর পাতা করমচা।

খুকু হাত তালি দিয়ে উঠল, বাঃ বাঃ; ভারী মজা তো! ও বাতাস, আমায় তোমার সংগে করে নিয়ে যাও, আমি তাদের দেখব। এই বলে খুকু দু হাত দিয়ে বাতাসের আঁচল চেপে ধরল।

বাতাস বলল, ও খুকু, আমায় ছাড়ো, ছাড়ো। আমি তোমায় কেমন করে নিয়ে যাব? আর তুমি চলে গেলে তোমার মা কাঁদবে যে।

খুকু বলল, না, মা কাঁদবে না। আমি তো আবার ফিরে আসব। ও বাতাস, আমায় নিয়ে যাও, আমি সারা পথ তোমার সংগে খেলতে খেলতে যাব।

বাতাস এবার আর 'না' বলতে পারল না। এমন একটি সুন্দর খুকু আর কেউতো দেখেনি। সবাই যে তার সংগে খেলতে চায়।

বাতাস বলল, সত্যি তুমি যাবে?

হুঁ, যাবই তো, খুকু নেচে উঠল।

তবে চোখ বোজো।

খুকু চোখ বুজল। বাতাস সুর করে মন্তর পড়তে লাগল,

আল্ ঘুরানি তাল্ ঘুরানি
আয়রে পাখা ফুর ফুরানি,
খুকুর গায়ে লাগ্ লাগ্
গায়ের বোঝা খসে যাক।

ও খুকু, চোখ মেলো, চোখ মেলে একবার চেয়েই দেখো না।

খুকু চোখ মেলে দেখে কি, ও মা সত্যিই তো, এ খুকু তো আর সে খুকু নেই। পাখীদের মত তার দু দিকে দুটো ডানা গজিয়ে গেছে। আর কি হালকা হয়ে গেছে সে। সে ভাবল, একটু নেড়ে দেখি তো পাখাটা, দেখি কি হয়। ও মা, যেই না নাড়া, সংগে সংগেই সে মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে তাদের সব চেয়ে উঁচু যে ঘরটা, সেই ঘরটাও তার পায়ের অনেক তলায় পড়ে রইল।

নীচের থেকে খুকুর মা দেখতে পেয়েছে। দেখেই ডাকাডাকি করতে লেগেছে, ও খুকু, যাসনে, ফিরে আয়, ফিরে আয়। খুকুর বাবা ডাকতে লাগল, ও খুকু, ফিরে আয়। তোকে ছেড়ে আমরা কেমন করে থাকব? খুকু বলল,

ও মা গো, ও বাবা গো,
কাঁদছো কেন, ছিঃ?
আজকে যাব, কাল আসব
কান্নাকাটির কি?

যেই ঝোপড়া আম গাছটার তলায় বসে খুকু পুতুল খেলত, সে খুকুকে ডেকে বলল, খুকু, যেওনা, তুমি চলে গেলে আমার তলায় বসে খেলবে কে? খুকুর পুতুলগুলি কেঁদে কেঁদে ডাকতে লাগল, যেও না, যেও না, তুমি না থাকলে কে আমাদের নিয়ে খেলবে? খুকুর বড় আদরের বেড়াল ছানাটা আকাশের দিকে চেয়ে ডাকতে লাগল, যেও না যেও না।

কিন্তু তখন বাতাস বয়ে চলেছে শন্ শন্ শন্, শোঁ শোঁ শোঁ। তার উপর গা ছেড়ে দিয়ে খুকু পাখা মেলে দিয়ে উড়ে চলেছে। কোন কথা তার কানে গেল না।

খুকু যে পথ দিয়ে চলেছে, তার এদিকে ওদিকে কত ছোট ছোট পাখী আকাশের বুকে খেলা করছে। তারা ডেকে বলল, ও খুকু, এসো, এসো, আমরা তোমার সংগে খেলা করব। খুকু বলল, না ভাই, অন্য সময় আসব। আমার যে এখন সময় নেই, আমার অনেক দূরের দেশে যেতে হবে।

ওরা জিজ্ঞেস করল, সে দেশ কোন দেশ ভাই?

খুকু বলল, সে অনেক দূরের দেশ। সে দেশে বিষ্টি হয় না, ঘাস গজায় না, ফসল ফলে না, ফুল ফোটে না। আমরা সেই দেশে গিয়ে ঝুপ্- ঝুপানি বিষ্টি নামাব। সে বড় মজার খেলা। পাখী, ও পাখী, তোমরা আমার সংগে যাবে?

ওরা বলল, না ভাই, আমাদের ছোট্ট পাখা। আমরা কি অত দূরে যেতে পারি?

পাখীরা পিছনে পড়ে রইল। বাতাস ছুটে চলেছে, শন্ শন্ শন্ শোঁ শোঁ শোঁ। সেই সংগে খুকু উড়ে চলেছে। এ পাশে ও

পাশে সাদা সাদা মেঘগুলো দল বেঁধে আসছে। আর নীচে, অনেক নীচে, মাঠ, জল, গাছপালা, কেবলই সরে সরে যাচ্ছে। খুকু দেখল, মাঠে গরু চড়ছে, পুকুরের মধ্যে হাঁসগুলি ডুবছে, আর উঠছে, ঘাটে বসে মেয়েরা বাসন মাজছে, বাড়ীর উঠোনে ছেলেমেয়েরা খেলছে, আরও কত কি সব। শেষে চলতে চলতে চলতে চলতে কত দিন আর কত রাত্রি পার হয়ে খুকু এসে পৌঁছল সেই অনেক দূরের দেশে।

খুকু জিজ্ঞেস করল, বাতাস ভাই, বাতাস ভাই, এ দেশের নাম কি? এ দেশের নাম নেই?

আছে বই কি, এ দেশের নাম রাজশাহী।

এঁ্যা, রাজশাহী! খুকু চমকে উঠে বলল, বা রে, এখানেই তো আমার ছোটকাকু থাকে। বাতাস বলল, ছোটকাকু? কোথায় থাকে তোমার ছোটকাকু?

খুকু বলল, ছোটকাকু? ছোটকাকু জেলখানায় থাকে।

ও বাবা, জেলখানায়! সেখানে তো সব দুষ্টু লোকেরা থাকে।

খুকু মাথা নেড়ে বলল, না না, আমার ছোটকাকু দুষ্টু নয়, আমার ছোটকাকু খুব ভালো। সে রোজ রোজ আমার কাছে চিঠি লেখে। আর কত গল্প লেখে। বাতাস ভাই, আমি আমার ছোটকাকুর কাছে যাবো।

বাতাস বলল, সে কি হয়! বাইরের মানুষ তো জেলখানায় যেতে পারে না।

খুকুর মনটা ভার হয়ে গেল।

বাতাস বলল, খুকু, দেখো দেখো, মেঘ দেখে ছেলেমেয়েরা কি নাচানাচি করছে।

সত্যি তো। খুকু পষ্ট শুনতে পেলো ওরা হাত তালি দিয়ে নাচছে আর গাইছে,

ঝুপঝুপানি ঝুপঝুপানি আয় আয় আয়
তোর হাতে দেব সোনার কাঁকন, নূপুর দেব পায়।
উড়কি ধানের মুড়কি দেবো
বাটি ভরে পায়েস দেবো
ঝুপঝুপানি ঝম্‌ঝমানি আয় আয় আয়।

এর পর আর কি বিষ্টি না এসে পারে! প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা তার পর ঝুপ ঝুপিয়ে, তার পর ঝমঝমিয়ে নামল। উঃ সে কি বিষ্টি, আর কি সে মেঘের গরগরানি!

খুকু বিছানায় চোখ মেলে চাইল। বাইরে তখন ঝমঝমিয়ে বিষ্টি পড়ছে। মা বলল, কি রে খুকু, ঘুম ভেংগে গেল?

খুকু অবাক হয়ে ভাবল, তাই তো, সে কেমন করে চলে এল? শেষে বুঝল বাতাস তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আহ্‌ হা, তার এমন সুন্দর পাখা দুটি তাও নিয়ে চলে গেছে!

খুকু বলল, মা, জানো, আমি এই মাত্তর অনেক দূরের দেশে গিয়েছিলাম। সেখানে ছোটকাকু থাকে।

মা বলল, দূর বোকা, তুই তো এতক্ষণ আমার পাশেই ঘুমোচ্ছিলি।

খুকু বুঝল, মা কিচ্ছু টের পায়নি। থাক, এখন আর কোন কথা বলে দরকার নেই।

মানুষের মত বাঁচতে চাই

রাণী রাজাকে বলল, রাজা তোমার বড্ড বেশী ঘুম। তুমি দিনেও ঘুমোও, রাতেও ঘুমোও। এত ঘুম কি ভালো? এত ঘুম ঘুমোলে রাজ্য চালাবে কি করে?

রাজা বলল, সে কি, বেশী ঘুমোলাম আবার কখন? সারা দিনে রাতে মোটে তো চব্বিশ ঘণ্টা। তার মধ্যে এ কাজ আছে ও কাজ আছে, নাওয়া আছে খাওয়া আছে, আরও কত কি আছে। রাজার কাজের কি কোন শেষ আছে? তার উপর যখন তখন তোমার এই ঘ্যান-ঘ্যানানি, প্যান-প্যানানি। এর মধ্যে কি আর ঘুমোবার যো আছে। মনের সাধ মিটিয়ে ঘুমোতে না পেরে আমার গায়ে আর যুত লাগছে না, রোগাও হয়ে যাচ্ছি দিন দিন।

রাণী অবাক হয়ে বলল, শোন কথা! রোগা না ছাই, তুমি তো দিব্যি মুটিয়ে চলেছ।

রাজা বলল, তোমার ওই এক কথা—মোটা হয়ে যাচ্ছি, মোটা হয়ে যাচ্ছি। আর কোন কথা জান না। বেশ, মোটা হয়েছি তো হয়েছি, এখন তুমি করতে চাও কি?

রাণী উত্তর করল, বা রে, আমি আবার কি করতে চাইব? আমার করবার কি আছে? আমি বলছি তোমার ভালোর জন্যই। যা হয়েছে হয়েছে আর বেশী মোটা হোয়ো না। এমনিতেই তো তুমি সারা খাটটা জুড়ে থাকো, আমি কোন মতে এক পাশে পড়ে থাকি। এর পর আরও যদি মোটা হও তখন আমার উপায়টা হবে কি?

রাজা এ কথা শুনে আগুন হয়ে উঠল। মোটা বললে রাজা বড় চটে যায়। সে বলল, তোমার একটু আক্কেল পছন্দ নেই।

সবাই বলে আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি, আর তুমি বল কি না আমি মোটা।

রাণী বলল, বলব না? আমি কি তোমার কর্মচারী না প্রজা যে তোমার ভয়ে তোমার মন রেখে কথা বলব? তুমি রাজা হতে পার, কিন্তু আমি তো রাণী। রাণী কখনও বাজে কথা বলে না।

এই নিয়ে কথা কাটাকাটি, শেষে তুমুল ঝগড়া। রাজা এক কথা বললে রাণী দশ কথা শুনিয়ে দেয়। রাণী রাজার চেয়ে ছোট কিসে? বরং এক কাঠি উপরে।

রাজা চাল তরোয়াল আর তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করতে জানে, কিন্তু মেয়ে মানুষের সংগে বিশেষ করে রানীর মত তেজী মেয়ে মানুষের সংগে ঝগড়া করে কুলিয়ে উঠতে পারে না।

রাণীর কাছে এ ভাবে নাস্তানাবুদ হয়ে রাজার সংসারে ঘেন্না ধরে গেল। তার মনে হোল, মা যার ঘরে নেই, আর বউ যার ঝগড়াটী তার ঘরও যা বনও তা। রইল পড়ে রাজত্ব আর সংসার, কাউকে কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রাজা। গেল তো গেল আর ফিরল না। কোথায় যে গেল তার কোনই উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

রাজ্যশুদ্ধ হাহাকার পড়ে গেল, আহা আমাদের এমন ভাল রাজা, সে রাজা আমাদের কোথায় চলে গেল? আসল কথাটা আর কেউ তো জানে না, এক জানে রাণী। সে কেঁদে কেটে অস্থির। কেনই বা এই সামান্য কথা নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়েছিল! মনের দুঃখে আহার নিদ্রা ত্যাগ করার অবস্থা। দলে দলে লোক ছুটল রাজার খোঁজ করতে। কিন্তু রাজার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

রাজাকে সবাই ভালবাসত। তার অভাবে কারু মনে আর সুখ নেই। আস্তাবলে রাজার বড় আদরের ঘোড়াটা রাজা চলে

যাবার পর থেকে একমুঠো দানা দাঁতে কাটতে চায় না। না খেয়ে মর-মর অবস্থা। রাজপুরীতে রাজার নিজের হাতে পোষা শুক পাখী মাথাও তোলে না, ডাকাডাকিও করে না খেতেও চায় না। এ ভাবে কদিন আর বাঁচবে। রাণী আদেশ দিলেন, দাও; ওই ঘোড়াকে ছেড়ে দাও, আর ওই শুক পাখীকে উড়িয়ে দাও।

যাবার সময় রাণী ঘোড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, যাও ঘোড়া, দেখ রাজাকে খুঁজে আনতে পার কি না। ঘোড়া সব কথা বুঝতে পারে, শুধু কথা বলতে পারে না। তার দু চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

শুকপাখীকে চুমু খেয়ে রাণী বলল, শুক, প্রাণের শুক, যে কথা কারু কাছে বলতে পারি না, সে কথা তোমার কাছে বলি। আমারই দোষ। আমি ঝগড়া করেছিলাম, সেই জন্যই রাজা রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

সকল পাখীর সেরা পাখী তুমি শুকপাখী, তুমি দেশ দেশান্তরের খবর রাখ, দেখ দেখি তুমি রাজাকে ফিরিয়ে আনতে পার কিনা। যদি রাজাকে নিয়ে আসতে না পার এ প্রাণ আমি আর রাখব না।

শুকপাখী কথা বলতে পারে। সে মুখ ফুটে বলল, মা, ভাবনা কোরো না। আমার চোখকে কোন কিছুই ফাঁকি দিতে পারে না। আমি যেমন করেই হোক রাজাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

শুকপাখীর কথা শুনে রাণীর মুখে এই প্রথম একটু হাসি দেখা দিল। ঘোড়া আর শুকপাখী একই সংগে যাত্রা করল রাজাকে ফিরিয়ে আনতে। এত মানুষ এত চেষ্টা করেও যা পারল না সামান্য পশু পাখী, ওরা কি তা পারবে? রাণীর ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, পারবে, ওরা পারবে।

এদিকে রাজা রাজপুরী ছেড়ে চলতে চলতে চলতে চলতে নিজের রাজ্য ছাড়িয়ে, আরও কত রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে শেষে

এক অজানা দেশে এসে পড়ল। রাগের মুখে চলে এসেছে, তখন কি আর হুঁশ ছিল! বেশী করে টাকা পয়সাও সংগে করে নিয়ে আসেনি। যেটুকু সম্বল ছিল, তা কিছু দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। এখন কি আর করে. এ বাড়ী যায়, ও বাড়ী যায়, লোকের বাড়ীতে অতিথি হয়ে ওঠে। কেউ কেউ আদর করে খাওয়ায়। কিন্তু সব মানুষ তো সমান নয়। মাঝে মাঝে উপোষ করেও কাটাতে হয়।

রাজা মানুষ, না খেয়ে থাকার অভ্যাস তো নেই। ক্ষিদের জ্বালায় বড় কষ্ট হয়। এ দিকে রাগের গরমটাও কমে এসেছে। এখন বুঝতে পারছে. এ ভাবে চলে আসাটা ঠিক হয়নি। রাজ্যের মধ্যেই সে রাজা, রাজ্যের মালিক হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কিন্তু রাজ্যের বাইরে তো তার এক পয়সার দামও নেই। এখানে কে তাকে চির কাল পুষবে? আর হাতের কাজও তো কোন দিন করেনি। কেমন করে রোজগার করে পেট চালাতে হয়, তাও তো তার জানা নেই।

মাঝে মাঝে মনে হয়, যাই ফিরে ঘরে। কিন্তু বড় লজ্জা লাগে, ফিরে গিয়ে কি বলবে? আর যাকে যা-ই বলে বোঝাক না কেন, রাণীকে তো আর কোন কিছু বলে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। এখন ফিরে গেলে রাণী নিশ্চয়ই টিটকারী দেবে, আর এই নিয়ে হাসাহাসি করবে। এ কথা মনে হলেই তখন বাড়ী ফেরার ইচ্ছাটা মন থেকে দূর হয়ে যায়। কিন্তু এ ভাবেই বা ক'দিন চলবে।

এক দিন পথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ ক'জন লোকের সংগে মুখোমুখি দেখা। সে দেশের রাজার কর্মচারী তারা। তারা কাজের লোক খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। রাজার মায়ের নামে এক দীঘি কাটানো হবে। বিরাট দীঘি। সেই দীঘি কাটবার জন্য হাজার হাজার লোকের দরকার। ওরা রাজাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, এই ব্যাটা, তুই কি কাজ করিস?

রাজা সত্যি কথাই বলল। বলল, আমি কোন কাজ করি না।

কোন কাজ করিস না। তবে খাওয়া জোটে কেমন করে? চুরী করিস্?

রাজা বলল, না আমি চুরী করি না, আমি এ বাড়ী ও বাড়ী খাই।

ও তুই তবে ভিখারী?

ভিখারী বলাতে রাজার মানে ঘা লাগল। সে তেজ দেখিয়ে বলে উঠল, কক্ষনো না। আমি ভিখারী হব কেন? আমি এক দেশের রাজা।

ওরা রাজার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল। ওদের সর্দার বলল, ধর তো ব্যাটা রাজাকে। ওর রাজাগিরি বার করছি। জোয়ান মর্দ ব্যাটা কাজকর্ম করবে না, শুধু পরের উপর খাবে।

একজন ওর হাতটা দেখে বলল, ইস দেখেছ ব্যাটার হাতটা একেবারে মাখনের মত নরম। কোন দিন কোন কাজকর্ম করেনি, চিরকাল সব কাজে ফাঁকি দিয়ে এসেছে। এবার কিছু দিন মাটি কাটুক, হাতটা মানুষের মত হয়ে উঠবে।

ওরা রাজাকে ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

রাজা বলল, বা রে আমি কি এ সব কাজ কোন দিন করেছি নাকি? ও আমি পারব না।

কিন্তু পারব না বললে শোনে কে! ওরা রাজার হাতে একটা কোদাল দিয়ে তাকে দীঘি কাটতে নামিয়ে দিল। না কাজ করে উপায় নেই। কাজে ঢিল দিলেই পিটুনি। এজন্য আলাদা লোকই নিযুক্ত আছে। তাদের কাজই হচ্ছে পিটুনি দেওয়া। এই ভাবে চলল মাসের পর মাস। মার খেতে খেতে রাজা কাজ করতে শিখল। আর তার চর্বিতে বোঝাই ভারী দেহটা ক্রমেই রোগা আর হালকা হয়ে আসতে লাগল।

এদিকে সেই ঘোড়া আর শুকপাখী রাজার খোঁজ করতে করতে সারা পৃথিবী ওলট পালট করে ফেলছে। কিন্তু তাদের

রাজা যে এই দূর দেশে এসে মাটিয়ালদের সংগে মাটি কাটতে নেমে গেছে, এ তারা কেমন করে বুঝবে? আর রাজার কি আর এখন সেই রাজার মত চেহারা আছে! দেখলে চেনা যায় না। কিন্তু শুকপাখীর নজরে শেষ পর্যন্ত তাও ধরা পড়ে গেল। যেটুকু সন্দেহ বা ছিল, রাজার গলার স্বর শুনে তাও আর রইল না।

শুকপাখী ঘোড়ার মাথার উপর নাচতে নাচতে বলল, ঘোড়া ঘোড়া, চেয়ে দেখ, ওই যে আমাদের রাজা।

ঘোড়া প্রথমে চিনতে পারেনি, পরে ভাল করে দেখে চিনতে পারল। আর তাকে পায় কে! সে মনের আনন্দে চিঁহি-চিঁহি করে ডেকে উঠল।

শুকপাখী বলল, চুপ, একটুও শব্দ কোরো না। দেখছ না এ শত্রুপুরী। তা না হলে আমাদের রাজাকে দিয়ে এমন ভাবে কাজ করাতে পারে! যেমনি আছ তেমনি দাঁড়িয়ে থাক, আমি আগে রাজার সংগে কথা বলে আসি। এই না বলে শুকপাখী ফুড়ুৎ করে উড়ে রাজার কাঁধের উপর বসে ডাকল, রাজা, রাজা।

আরে শুক, তুমি কেমন করে আমার খোঁজ পেয়ে এখানে এলে? রাজার মনটা খুশীতে টগবগ করে উঠল।

শুকপাখী বলল, সে কথা এখন থাক। ওই যে আপনার ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আপনি এক্ষুনি গিয়ে ওর পিঠে চেপে বসুন।

আমার ঘোড়া? কই? এবার রাজা তার আদরের ঘোড়াকে দেখতে পেলেন। চোখে চোখ মিলতে ঘোড়া অস্থির হয়ে লাফালাফি করতে লাগল। সে যেন বলছিল, এত দেরী করছ কেন? শীগগির শীগগির চলে এসো। কিন্তু এসো বললেই তো যাওয়া যায় না। রাজার পাহারাদার লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাজ ছেড়ে একটু নড়লে আর কি উপায় আছে, দমাদ্দম লাঠি চালাবে।

কিন্তু ঘোড়াটা ততক্ষণে সবার চোখে পড়ে গেছে। পাহারাদারদের সর্দার বলল, বা রে কি সুন্দর ঘোড়াটা! এমন সুন্দর ঘোড়া

আর তো কোন দিন দেখিনি। ধর তো ওকে, বলে সে দুজন কাজের লোককে পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু ধরবে কি, কাছে যেতেই ঘোড়ার পায়ের লাথি খেয়ে তারা চিৎপটাং। দুজনের এই অবস্থা দেখে আরও চারজন এগিয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়ার কাছে ঘেঁষে কার সাধ্য। ঘোড়া বিকট হাঁ করে কামড়াতে এল। যারা এগিয়ে এসেছিল, তারা আর পালাবার পথ পায় না। সবাই বলল, পাগলা ঘোড়া। এটাকে মেরে ফেল।

ঘোড়া নিয়ে মহা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে। কাজ কর্ম বন্ধ রেখে সবাই এসে ভিড় করছে। এই সুযোগে রাজা এগিয়ে এসে বলল, না না, এ ঘোড়া পাগলা নয়। এমন ঘোড়া খুব কমই মেলে। তবে এ ঘোড়ার রহস্য যে জানে, সেই শুধু একে ধরতে পারবে, আর কেউ পারবে না। আমি এ ঘোড়া ধরতে পারি।

একজন পাহারাদার বলল, যাও না দেখি, কেমন বাহাদুর। এ ঘোড়ার একটা চাঁট খেলে মুখ দিয়ে আর কথা বেরোবে না।

বাস, আর রাজাকে পায় কে। সে এক ছুটে ঘোড়ার কাছে গিয়ে পৌঁছল। তাকে দেখে ঘোড়া আনন্দে চিঁহি চিঁহি করে ডেকে উঠল।

সবাই ভাবল এবার আর তার রক্ষা নাই। যে ঘোড়া কে জানে, হয়তো বা চিবিয়েই খেয়ে ফেলবে। রাজা আদর করে ওর পিঠের উপর চড় মেরে লাফ দিয়ে উঠে বসল। আর ঘোড়া তাকে নিয়ে বাতাসের মত বেগে ছুটল। আর মাথার উপরে শুকপাখী তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

লোকগুলো কতক্ষণ পর্যন্ত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। শেষে ধর ধর করতে করতে ঘোড়ার পিছন পিছন ছুটল। কিন্তু তখন আর তাদের লাগ পায় কে!

রাজা তার রাজ্যে ফিরে এল। সারা রাজ্যে আনন্দ উৎসব শুরু হয়ে গেল। এত দিন বাদে রাণীর মুখে প্রাণ খোলা হাসি ফুটল। শুধু

কি রাণী? রাজাও হাসছে। সবাই হাসছে। ঘোড়া আর শুকপাখীর নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

কিন্তু সবাই অবাক হয়ে দেখল, রাজা আর সে রাজা নেই। দিব্যি ছিপছিপে চেহারা নিয়ে ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়। আর তেমন করে ঢিমিয়ে, ঢিমিয়ে হাঁটে না তো। কোথায় গেল সেই মোটা সোটা থলথলে শরীরটা? রাণী বলে, আমি তো আর তোমায় চিনতেই পারি না। তুমি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছ।

রাজার কি যে হয়েছে, এক দণ্ড বসে থাকতে পারে না। এ কাজ করবে, সে কাজ করবে, কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। রাণী বলে, তুমি একটু বিশ্রাম নাও তো। তুমি রাজা মানুষ, তুমি এত খাটবে কেন? তোমার দাস দাসীর অভাব আছে কিছু? রাজারাজড়াদের এত বেশী কাজ করতে নেই। দেখলে লোকে বলবে কি?

রাজা কোন কথার উত্তর দেয় না, শুধু মিটি মিটি হাসে। রাণী বলে, তুমি তো আগে দিনের বেলায় খাওয়ার পর একটু ঘুমোতে। এখন তো তাও দেখি না। এত বেশী খেটে খেটে তোমার অমন সুন্দর শরীর কি হয়ে গেল।

রাজা বলল, রাণী, তুমি আমাকে কাজ করতে বাধা দিও না। আমার ভাগ্য ভাল, আমি এত কাল বাদে কাজ করার স্বাদ বুঝতে পেরেছি। আমি এত দিন শুধু রাজাই ছিলাম, মানুষ ছিলাম না। আমি এখন থেকে মানুষের মত বেঁচে থাকতে চাই।

চালতা গাছের মাচা

মানুষ থাকে মাটির উপর—ঘরে কি দালানে। আর পাখীরা থাকে গাছের উপর। এইটাই নিয়ম। শুধু এখন বলে নয়, চিরকালই এই নিয়ম চলে আসছে। তবু মানুষের বাচ্চা হয়েও ওরা দু ভাই গাছের আগায় বাসা বাঁধল। যে দেখে সে-ই হাসে। এমন কাণ্ড কেউ কোন দিন দেখছে?

দুটি ভাই—বলটু আর পলটু। ওদের নিত্যি নতুন খেলা। এ সব খেলার নামও কোন দিন কেউ শোনেনি। কে যে ওদের মাথায় এ সব বুদ্ধি যোগায় কে জানে! খুঁজে খুঁজে শেষে দক্ষিণ দিকের চালতে গাছটাকে ওরা বাছাই করল। এই গাছের মাথায় মাচা বাঁধতে হবে। যেমন কথা তেমান কাজ। সংগে সংগেই কাজ শুরু হয়ে গেল। গাছের একেবারে মাথার দিকে তিনটে ডাল পাশাপাশি চলে গেছে। তার উপর বাঁশ বেঁধে ওরা দেখতে দেখতে এক দিব্যি মজবুত মাচা বানিয়ে ফেলল।

সেই থেকে কি যে হয়েছে, দিনের অনেকটা সময় ওরা মাচাতেই কাটায়। লেখা পড়া চুলোয় গেছে, সারা দিন গাছের উপর কাঠ-ঠোকরার মত খালি খুটুর খাটুর চলেছেই। কত যে কাজ! কাজ আর শেষ হয় না। এখানে কমায়, ওখানে বাড়ায়, এখানে কাটে, ওখানে জোড়া দেয়, কাজ লেগেই আছে। বাঁশের মাচার উপর পুরু করে খড়েরগদি বানাল। একেবারে রাজশয্যা। দুজনে আরাম করে বসা যায়, আবার গুটিশুটি হয়ে শোয়াও যায়।

ওদের খেলার সাথীরা খবর পেয়ে দেখতে এল। মাচা দেখে তারা তারিফ করে বলল, বাঃ বেশ একখানা বাড়ী হয়েছে তো।

বলটু আর পলটু আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল। হবে না? এ যে তাদের নিজেদের হাতে তৈরী বাসা।

ছেলেরা বলল, কিন্তু তোরা খেলতে আসিস না কেন?

বলটু উত্তর দিল, খেলব কি রে, আমাদের এখন কত কাজ! পলটু বলল, তোরা নিজেরাই খেল গে যা, আমাদের কত কাজ, না রে দাদা?

কিন্তু শুধু খেলাধুলোই নয়, পড়াশুনোও তাকে উঠল। মা কেবল রাগারাগি করে, লেখা নেই, পড়ি নেই, সারা দিন শুধু গাছের উপরে—এ সব কি? মায়ের ঘ্যানঘ্যানানিতে উত্যক্ত হয়ে ওরা ওদের বইপত্র বগলদাবা করে নিয়ে মাচার উপর উঠে বসত, আর বলত, নীচে বড় গোলমাল, ওখানে নিরিবিলিতে পড়া নাকি খুব ভাল হয়। মা নীচের থেকে ডাকাডাকি করলে ওরা জবাব দিত, আঃ গোলমাল করছ কেন? আমরা পড়ছি যে।

মা ভালমানুষ, নীচ থেকে খুব পড়ার শব্দ শুনে ভাবত, থাক, পড়ছে পড়ুক। ঘরে থাকলে তো একটুও পড়তে চায় না। কিন্তু পড়াশোনা যে কেমন এগোচ্ছে একমাত্র চালতা গাছটাই তা বলতে পারত।

বড় বোন হাসি, তার ইচ্ছা সেও একবার উপরে উঠে দেখে আসে ওদের বাসাটা। এখন তো অনেকেই দেখতে যায়। কিন্তু মেয়ে মানুষ কেমন করে গাছ বেয়ে উঠবে। হাসি ডেকে বলল, কি রে তোরা সারা দিন উপরে এত কি করিস? তোরা কি পাখী হয়ে গেলি?

ওরা বলল, হ্যাঁ, আমরা পাখীই তো।

তবে ওই উপরেই থাক। আর বাড়ীঘরে ঢুকতে পারবিনা। ওই খানেই খাবি দাবি, ওই খানেই ঘুমোবি।

ওরা বলল, দাঁড়াও না, মাচাটাকে আরও বড় করে নি। ক্রমে ক্রমে সবই হবে। তোমরা তোমাদের ওই মাটিতেই পড়ে থাকবে। আর আমরা থাকব তোমাদের সবার মাথার উপরে।

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী

সত্যি ক্রমে ক্রমে অনেক কিছুই হতে লাগল। জোড়া তালি দেওয়ার ফলে মাচাটারও আকার অনেকটা বেড়ে গেল। ওদের মাথায় নতুন নতুন ফন্দি খেলতে লাগল।

এক দিন দেখা গেল ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি গাছের উপর উঠছে। এত বড় গাছ বেয়ে মাটি তোলা বড় সহজ কথা নয়। খাটতে খাটতে ওরা দু ভাই একেবারে গলদঘর্ম হয়ে উঠল।

নীচে হাসি অবাক হয়ে হাঁ করে ওদের কাজ দেখছিল। সে জিজ্ঞেস করল, মাটি তুলে কি করবি রে তোরা? ওরা বলল, ঘর বাড়ী তুলব।

ঘর বাড়ী তুলবি কি রে? গাছের উপর কেউ ঘর বাড়ী তোলে নাকি? বলটু পলটুর তখন বাড়তি কথা বলার সময় নেই। তারা ভীষণ ব্যস্ত।

হাসি ঘরে ফিরে ফলাও করে এই গল্প করল। পাড়াশুদ্ধ এই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে লখার বাড়ীর বলটু আর পলটু গাছের উপর ঘর বাড়ী তুলছে। ওরা দু ভাই নাকি সেখানেই বসবাস করবে।

শুনে সবাই হাসল। কিন্তু বলটু পলটুর মা হাসতে পারল না। ওরা যেন দিন দিন বাড়ী ঘরের সম্পর্ক ছেড়েই দিচ্ছে। নেহাৎ যেটুকু সময় না থাকলে নয়, সেইটুকু সময়ই ঘরে থাকে। একটু ফুরসুত পেলে আর কথা নেই, অমনি গাছের মাথায়। তা ছাড়া অত উঁচু গাছ, পড়ে গেলে আর কি উপায় আছে। মা অনেক চেষ্টা করল কিন্তু এই পাগলদের ঠেকানো তার অসাধ্য। কথা বললে কি কথা শোনে?

হাসি বলল, ওদের ভয় না দেখালে চলবে না। রাত্রিবেলা খাওয়ার সময় খেতে খেতে সে ওদের বলল, তোরা যে সব সময় চালতা গাছের উপর বসে থাকিস ভয় হয় না তোদের?

ভয়? কেন, ভয় কিসের?

ভয়? কিসের? তাও জানিস না? চালতে গাছের কাছেই

তো ওই গাব গাছটা।

হ্যাঁ আছেই তো গাব গাছটা, তাতে কি হয়েছে?

কি হয়েছে! ওই গাছে যে একটা ভূত থাকে—এ কথা তো সবাই জানে। জানিস না রাতের বেলা গাব গাছের উপর একটা পা আর তোদের চালতে গাছটার উপর একটা পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে!

পলটু গল্প শুনে ঝুঁকে পড়ল, কেন রে দিদি? অমন করে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? ওর কষ্ট হয় না? আমি বাড়া থেকে অংক করে নিয়ে যাইনি বলে এক দিন অংকের স্যার আমাকে অমনি করে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। বাপরে বাপ, সে কি টনটনানি! পা দুটো যেন ছিঁড়ে যেতে চায়।

হাসি বলল, হ্যাঁ, ভূতের আবার কষ্ট! ওরা তো অমনি করে দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালবাসে।

বলটু পলটুর চেয়ে দু বছরের বড়। সে ভূতের গল্পকে আমল না দিয়ে বলল, আমাদের হেডমাষ্টার বলেছেন, ভূত বলে কোন কিছু নেই। ও সবই ফাঁকি-জুকি।

হ্যাঁ। তোদের হেডমাষ্টার তো সব কথাই জানে। পড়ত এক দিন আসল ভূতের পাল্লায় তবে বেরিয়ে যেত মজাটা। ও বাড়ীর ছিদাম কাকা নিজের চোখে দেখেছে, ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, একটা ঠ্যাং গাব গাছে, আর একটা ঠ্যাং চালতে গাছের উপর রেখে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা—

বলটু কালে ভাল উকিল হতে পারবে। সে ফস করে জেরা করে বসল, অমন ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে দেখতে পেল কি করে?

হাসি একটু থেমে গিয়ে ঢোক গিলল, পরক্ষণেই বলে উঠল, বাঃ দেখতে পাবে না। হাতে টর্চ ছিল যে। টর্চটা জ্বালাতেই দেখে—ওরে বাবা, সে কি মূর্তি!

পলটু বলল, কিন্তু ও আমাদের কি করবে। আমি যে মানীদির কাছ থেকে মন্তরটা শিখে নিয়েছি। যেই না দেখব, অমনি মন্তরটা ছাড়ব,

ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি
রাম লক্ষ্মণ বুকে আমার করবি তোরা কি ?

এই মন্ত্র পড়লে আর কি ভূত থাকতে পারে ! মানীদিকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

হাসি বলল, ও সব আগেকার দিনে চলত। আজকালকার দিনের ভূতেরা ও সব মন্তর-টন্তর মানে না। আর তোরা ওর পা রাখবার জায়গাটায় ঘর বানাবি, ও চটবে না ?

বলটু তার কথা উড়িয়ে দিল, হুঁঃ, তোমার যত বাজে কথা। ও সব ভূত-টুত আগেকার দিনে মানত। আজকালকার লোকে মানে না। হেডমাষ্টার বলেন —

ধেত্তেরি তোর হেডমাষ্টার ! অমাবস্যা রাত্রিতে নিয়ে আসিস ধরে তাকে ওই গাব গাছের তলায়। বেরিয়ে যাবে হেডমাষ্টারী।

বলটু-পলটুকে কিন্তু ভূতের ভয় দেখিয়ে থামিয়ে রাখা গেল না। দিদির কথাটা মনে করে প্রথম প্রথম দু-একদিন গা একটু ছম্‌ছম্‌ করেছিল। কিন্তু পরে তা কেটে গেল। তারা আবার নিশ্চিন্ত মনে তাদের নতুন ঘর সংসারী করে চলল।

ঘর সংসারী করে চলল বটে, ঘর কিন্তু আর তৈরী করা হোল না। কেমন করে হবে ? মাটি তুলে মাচার উপর ঘরের ভিত গাঁথবার কিছু দিন বাদেই ওরা অবাক হয়ে দেখল, কি আশ্চর্য, মাটি ফুঁড়ে অনেক ঘাসের অংকুর উঠেছে। দেখ দেখি কাণ্ড। এখানে আবার ঘাস উঠল কেমন করে ? এ নিয়ে দু ভাই অনেক গবেষণা করল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বোঝা গেল। ঘাসের মত দেখতে হলে কি হবে, ওগুলো কিন্তু আসলে ঘাস নয়। ওগুলো সব ধানগাছের চারা। মাচার উপর ওরা সেই যে খড় পেতেছিল, তার সংগে যে কিছু কিছু ধানও ছিল, সে খবর তো ওরা রাখত না। মাটি পেয়ে ধানের চারা মাথা তুলে উঠেছে। একটা চারা টেনে তুলতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

সংগে সংগে পুরানো প্ল্যানটা বাতিল হয়ে গেল। ঘর নয়, এবার ক্ষেত বানাতে হবে। চারাগুলি দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল। বলটু-পলটুর আনন্দ আর ধরে না। ওরা বলল, আমরা এবার গাছের উপরেই চাষ-বাস করব। শুধু কথার কথাই নয়; ধান ক্ষেতের একপাশে ওরা শশার বীজ পুঁতল। কি মজা, ধান গাছের মত শশা গাছও এক দিন মাথা জাগিয়ে উঠল। প্রথম দুটো-তিনটে পাতা ছাড়ল, তার পর আর সমস্ত শশাগাছের মত সেটিও লতা হয়ে বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল।

এবার ওদের সামাল দিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। ধান ক্ষেত আর শশা গাছ নিয়ে তারা লাফালাফি, চেঁচামেচি, মাতামাতি করতে লাগল। কিন্তু মা, মানীদি আর দিদি কেউ এ কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা বলল, যত সব বাজে কথা, চালতা গাছের উপরে ধানক্ষেত আর শশাক্ষেত এমন কথা কেউ কোন দিন শুনেছে? এমন মুশকিল ওদের নিয়ে দেখাবারও উপায় নেই। ওরা তো কেউ গাছে উঠতে পারে না।

অবশেষে পাড়ার দুজন ছোকড়া গাছে উঠে স্বচক্ষে দেখে এসে সাক্ষ্য দিল, না, কথা ঠিকই। সুন্দর ধান গাছ হয়েছে। আর শশা গাছটায় কুঁড়িও দেখা দিয়েছে একটা। আর ওরা বলল, পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানের কথা শুনেছি, আর এই দেখলাম বলটু-পলটুর শূন্য উদ্যান। এর পর মা'রা বিশ্বাস না করে পারল না।

খবরটা এবার সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। স্কুলের ছেলেরা দল বেঁধে দেখতে আসতে লাগল। বলটু-পলটুকে আর পায় কে? মুখের চোটে মা, মানীদি আর দিদিকে ওরা ঠাণ্ডা বানিয়ে ছাড়ল। ওরা বলল, এর পর ওরা একটা একটা করে সবগুলো গাছে এমনি করে ক্ষেত বানাবে, আর নানা রকম ফসল ফলবে তাতে।

মা আঁতকে উঠে বলল, বলিস কি রে?

বল্টু বলল, হ্যাঁ, একটা গাছও বাকী থাকবে না। এমনি করে গাছের মাথায় মাথায় আর একটা পৃথিবী তৈরী করে তুলব আমরা। নীচে থাকবে তোমাদের পৃথিবী, আর তার উপরে আমাদের পৃথিবী।

বাড়ীর পুরানো ঝি মানদা ওরফে মানীদি এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। কিন্তু এবার আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে বলে উঠল, এমন কথা বোলোনা, বলতে নেই। একমাত্র ভগমান ছাড়া আর কেউ পৃথিবী বানাতে পারে না।

বল্টু বলল, রেখে দাও তোমার ভগবান। আমরা ভগবানের চেয়ে কম কিসে? আমাদের হেড মাষ্টার বলেন—

মানীদি এমনিতে ঠাণ্ডা মানুষ, কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ চটেও ওঠে। সে বলল, তোমাদের ওই পোড়া কপালে হেড মাষ্টারের কথা আর বোলো না। এসব কথা শুনলেও পাপ। এই বলে দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে চলল, তিশংকু রাজা ভগমানের উপর টেক্কা দিতে গিয়েছিল। বলেছিল, আমি আর একটা সগ্‌গ বানাব। আর তার ফলটা হোল কি? ভগমান দপ্‌পহারী, তিনি কারু দপ্‌প সহ্য করেন না।

কি আশ্চর্য, সেই রাত্রিতেই ভীষণ ঝড় উঠল। এমন ঝড় শীগগির কেউ দেখেনি। ওরা দু ভাই শুয়ে শুয়ে ওদের মাচাটার কথাই ভাবছিল। পর দিন ভোর হতে না হতেই এক ছুটে চালতা গাছের তলায় গেল। গিয়ে দেখে হায় হায়, কোথায় গেল মাচা। একটা বাঁশ শুধু ঝুলছে, আর কোন চিহ্ন নেই তার। অনেক খুঁজে কয়েকটা ধানের চাপড়ার খোঁজ পাওয়া গেল। কিন্তু শশা-গাছটা কোথায় যে গেছে, অনেক খুঁজেও তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

ওরা দু ভাই চালতা গাছের তলায় গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। ওরা নতুন পৃথিবী গড়তে চলেছিল, কিন্তু এখন আর কোনই উৎসাহ পাচ্ছে না। এমন সর্বনাশ কে করল? দিদির সেই

বিকট মূর্তিটা যে একটা ঠ্যাং গাবগাছে আর একটা ঠ্যাং চালতা গাছে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই? নাকি মানীদির দপ্‌পহারী ভগমান? বলটু পলটু ভাংগা মাচার ধ্বংসাবশেষ বাঁশটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল।

ডাকু

বিড়ালের বাচ্চাটা খুঁত্ খুঁত্ করে কাঁদছিল।

ওর মা জিজ্ঞাসা করল, কিরে অমন করে কাঁদছিস কেন? কি—হয়েছে কি?

বা রে কাঁদব না? আমার খিদে পেয়েছে যে।

ও মা, খিদে পেয়েছে তো খা। কান্নাকাটির কি হয়েছে? তোকে নিয়ে আর পারি না বাপু, খুঁত্ খুঁত্ আর খ্যাঁত খ্যাঁত দিন রাত লেগেই আছে। যা, কাল রাত্তিতে দুটো ইঁদুর মেরে খাটের তলায় রেখে দিয়েছি। ওর মধ্যে বাচ্চা ইঁদুরটা খা গিয়ে। বড়টা কিন্তু খাসনে। ও তুই হজম করতে পারবিনে। যা তোর শরীর, পেটের অসুখ তো লেগেই আছে।

বাচ্চা যেমন ছিল তেমনি বসে রইল। মার কথাটা যেন ওর মনে লাগেনি। একটু বাদেই সে আবার তেমনি করেই খুঁত্ খুঁত করতে লাগল।

আরে, আবার কি হোল? কান্না কিসের জন্য? কই খেতে বললাম, খেলিনে যে।

বাচ্চা নাকে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি রোজ রোজ ইঁদুর খেতে পারি না। আমার ভাল লাগে না।

ও মা ছেলের কথা শোন একবার। ইঁদুর খাবি না তো খাবি কি তবে শুনি? ইঁদুরের মত মিঠা কি? যাও লক্ষ্মী সোনা, খাও গিয়ে।

না, মিষ্টি খাব আমি। এ বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলো রোজ রোজ গুড়, চিনি, পায়েস, পিঠে—আরও কত কি কি মিষ্টি খায়, তুমি

কি কিচ্ছু দেখ না? কত দিন হয়ে গেল তুমি আমাকে একটু মিষ্টি খেতে দাও না।

ওর মার মনটা একটু ভার হয়ে এল। আহা, তাই তো, ছেলে মানুষ, এটা ওটা তো খেতে চাইবেই। এই তো খাওয়ার সময়। কিন্তু মিষ্টি সে কেমন করে এনে দেবে! তার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল।

সে বলল, ও আমার কপাল, মিষ্টিই যদি খাবি, তবে বেড়ালের ঘরে এসেছিস কেন? এ সব তো আমাদের জন্য নয়। ভাল ভাল জিনিস সব কিছু মানুষেরাই খায়। এইটাই নিয়ম। পিরথিবী যেদিন থেকে ছিষ্টি হয়েছে, সেদিন থেকে এই নিয়মই চলে আসছে।

বাচ্চাটা পেট-রোগা হলে কি হয় তেজ আছে। একেবারে ফোঁস করে তেড়ে উঠল। এ্যাঁ, বেড়াল বলে আমরা যেন মানুষ নই। ওরাই সব খাবে, আর আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখব। ও চলবে না। আমি আজ খাব না। কিচ্ছু খাব না। মিষ্টি আমাকে এনে দিতেই হবে, যেখান থেকে পারো।

ইস, কি জেদী ছেলে বাবা। খেল না, কিছুতেই খেল না। দুপুর গেল বিকাল গেল, রাত গেল তবুও না। মা কত করে বোঝাল—উঁহুঃ কিছুতেই না। সে মরে গেলেও খাবে না। বেচারা মা, কি আর করবে। বাচ্চাকে ফেলে কি করে খায়, সারা দিন সারা রাত তার পেটেও কিছু পড়ল না।

পর দিন রাত ভোর হলে বেড়াল আর তার বাচ্চা রোজকার অভ্যাস মত হাই তুলে একটা বুকডন দিয়ে নিল। আর অমনি সংগে সংগে ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করে উঠল।

বেড়াল বলল, তুই বোস, আমি বাজারটা একটু ঘুরে আসি, দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা।

বাচ্চা আনন্দে লাফিয়ে উঠল: আমি তোমার সংগে যাব মা।

হ্যাঁ, কাল সারা দিন রাত্তির কিচ্ছু খাসনি, তুই যাবি কি রে? তুই থাক বাবা, আমি যাব আর আসব।

বেড়াল বাজারে গেল। ময়রা তখন সবেমাত্র দোকানের পাট খুলেছে। বেড়াল বলল ময়রা দাদা, আমার বাচ্চাটা বায়না ধরেছে মিষ্টি খাবে। অবুঝ শিশু, বোঝে না তো, কাল রাগ করে সারা দিন কিচ্ছু খায় নি। আমাকে কিছু মিষ্টি দাও।

ময়রা বলল, মিষ্টি নিবি তো পয়সা দে আগে।

ও মা, আমি গরীব বিড়ালনী, আমি পয়সা কোথায় পাবো গো! ও ময়রা দাদা, তোমার ভাগনেটার কথা মনে করে এমনিতেই টো মিষ্টি দিয়ে দাও।

ভাগনে! ময়রা ক্ষেপে উঠল। বটে, ভাগনে! একটা বেড়ালের বাচ্চা, সে কিনা তার ভাগনে, সাহস দেখ!

দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজাটা!

একটা চেলা কাঠ তুলে সে জোরসে ছুঁড়ে মারল। বেড়ালের মনে হোল তার পিঠটা যেন ভেংগে গেছে। কিসের মিষ্টি, কিসের কি, ছুটতে ছুটতে একদম বাড়ী এসে হাজির।

বাড়ীতে ফিরে এসে আবাক হয়ে দেখে বাচ্চা মহা ফুর্তিতে নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে। মাকে দেখে তার আনন্দ আর ধরে না। দেখা মাত্রই সে লেজ তুলে ছুটে এসে তাকে ঘিরে ড্যাং ড্যাং করে নাচতে লাগলো আর গাইতে লাগল:

মিষ্টি পেলাম মিষ্টি পেলাম,
চাকুম চুকুম খাবার খেলাম,
ক্যাবলা খোকার খাবলা মেরে
সুড়ুৎ করে পালিয়ে এলাম।

বাচ্চার কাণ্ড দেখে মা তো অবাক। ক্ষিদের জ্বালায় পাগল হয়ে গেল নাকি? ও সব আবোল তাবোল কি সব বকছে?

হ্যাঁ রে, কোথায় পেলি মিষ্টি? কে দিয়েছে?

বাচ্চা নাচ গান থামিয়ে এক টুকরো খাবার মায়ের মুখে তুলে দিয়ে বলল, আগে খাও, বলছি পরে।

আঃ কি সুন্দর গন্ধ! আর খিদেও লেগেছিল প্রচুর। মুখে দিতে দিতেই গলে গেল।

আহা, কি তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেলরে! বেড়াল তার জন্মেও এমন খাবার খায়নি।

বাচ্চা বলল, খুব ভালো না, মা?

উঃ খুব ভাল। কোথায় পেলি বল দেখি?

কোথায় পেলাম? শোন তবে। এ বাড়ীর ছোট্ট ছেলেটা খাচ্ছিল বসে বসে। আমি গিয়ে বললাম, এই ছেলে, একা একা খাচ্ছিস কেন রে? অর্দ্ধেক আমাকে দে, অর্দ্ধেক তুই খা। আমার কথা শুনে ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল, ম্যা!

মাকে ডাকা হচ্ছে? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা। সংগে সংগেই ওর দু গালে দুটো চড় বসিয়ে দিয়ে খাবারটা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে এলাম। তখন সেই ছেলেটা ষাঁড়ের মত গলায় চেঁচাতে লাগল ভঁ্যা।

এ্যা করেছিস কি হতভাগা। চোর ছ্যাচ্চোর বদনাম ছিল না আমার কোন দিন। শেষ কালে তুই আমার নাম ডোবালি? পরের জিনিস না বলে নিতে আছে? ছি ছি ছি।

বাচ্চা জবাব দিল, হঁ্যা, না বলে বুঝি? আমি তো বলেই নিয়ে এলাম। চাইলাম তো দিলনা কেন? আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে—আহলাদ!

মা গম্ভীর হয়ে বলল, এ সব ভাল নয় বাছা। ভাল বেড়ালরা এমন কাজ কক্ষনও করে না।

বাচ্চা বলল, জোর করে না নিয়ে এলে ও বুঝি আমাকে দিত? বেশ করেছি, এনেছি। আরও আনব। রোজ আনব। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে—আহ্লাদ। বলতে বলতে হঠাৎ ওর একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে আর সব কথা ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে

উঠল : ও মা, বা রে, বাজার থেকে মিষ্টি আনতে গিয়েছিলে। কি নিয়ে এলে আমার জন্যে ? দাও, এক্ষুনি দাও।

ওর মার মুখে আর কথা নেই। বাচ্চাকে কি বলে এখন বুঝ দেবে ? এত করে সে মিনতি করল, কিন্তু একটা কিছুও তো দিল না হতভাগা ময়রাটা। দিল তো না-ই, উঃ তার উপর কি মারটা না মারল ! ওই কথাটা মনে হতেই পিঠের সেই বেদনাটা বিষম টনটন করে উঠল।

চোর

চোর গেল রাজবাড়ীতে চুরী করতে। কিন্তু রাজ বাড়ীতে চুরী করা—সে কি আর চাট্টিখানি কথা? পাহারাওয়ালাগুলো সারা রাত জেগে জেগে পাহারা দেয়। একটু পায়ের শব্দ কি খচর মচর শুনলে আর কি রক্ষা আছে! অমনি বাজখাঁই গলায় হেঁকে ওঠে—কৌন হ্যায় রে? ওরে বাপরে বাপ, সে কি গলা, শুনলে পরে পেটের পিলে চমকে ওঠে।

আচ্ছা, এমন করলে চুরী করা যায়? চোর এদিকে যায়, ওদিকে যায়, উঁকি মেরে দেখে, উঁহুঃ কোথাও একটু ফাঁক নেই। ভীমের মত পালোয়ান সব লাঠি বাগিয়ে বসে আছে। একটু টের পেলেই পিটিয়ে ময়দা বানিয়ে ছাড়বে। নাঃ, এখানে চুরী করা চলবে না। চোর মনের দুঃখে রাজবাড়ী থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এল।

রাজবাড়ী থেকে নেমে চোর কিপ্পিন বুড়োর বাড়ীতে এসে উঠল। সবাই জানে কিপ্পিন বুড়োর অনেক টাকা। বুড়ো রাত দিন এক কাঁড়ি টাকা আগলে বসে থাকে। নিজেও খাবে না, কাউকে খেতেও দেবে না। টাকা দিয়ে ওর কোন লাভ? চোর, মনে মনে ভাবে, এ থেকে এক মুঠো টাকা পেলে বেঁচে যাই। যা থাকে কপালে বলে চুপি চুপি ঘরের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

কিন্তু চোর কি জানত যে বুড়ো সারা রাত্রি ঘুমায় না। কাঁঠাল গাছটার তলায় শুকনো পাতা জড় হয়ে আছে, পা পড়তেই মচ্ মচ্ করে উঠল। সংগে সংগে বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল: অ গিন্নী, গিন্নী, ওঠ, ওঠ, চোর এসেছে, চোর।

চোর চমকে উঠল, সর্বনাশ, এত রাত্তিরে বুড়ো এখনও জেগে আছে। তাকাতাকিতে জেগে উঠে বুড়ী রাগ করে উঠল, ভাল রে ভাল, কি বিপদেই পড়া গেছে। তোমার জ্বালায় একটু ঘুমোনোও যাবে না। ব্যস এই পর্যন্তই, আর কোন সাড়া শব্দ নেই। চোর বুঝল বুড়া পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু বুড়ো তো ঘুমোয়নি। এ অবস্থায় জেনে শুনে সিঁদ কেটে ঘরে ঢোকাটা কি ভাল হবে? চোরদের তো এ নিয়ম নয়। এর নাম ডাকাতি। সে চোর হয়ে ডাকাতি করতে যাবে কেন? এই সব নিয়ে সাত পাঁচ ভাবছে, এমন সময় তার মুখের সামনে একটা দরজা খুলে গেল। ঘরের পিছন দিকে যে একটা দরজা আছে, চোরের তো তা জানা ছিল না।

দরজা খুলে বুড়ো ডেকে উঠল—এই ব্যাটা, দেখতে পেয়েছি। এ্যাঁ, আমার ঘরে চুরী করতে এসেছিস! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।

ও বাব্বাঃ এ অবস্থায় চোর যদি সত্যিকারের চোর হয়, সে কি কখনও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? কক্ষনও না। চোর আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না।

সব জিনিসেরই একটা নিয়ম আছে। রাত্রির সৃষ্টি হয়েছে কেন? ঘুমোবার জন্য, আর চোরেরা যাতে চুরী করতে পারে সেই জন্য। একথা তো সবাই জানে। কিন্তু মানুষ যদি এমন করে উলটো পালটা কাজ করে, ঘুমোবার সময় না ঘুমিয়ে জেগে বসে থাকে, তা হলে চোরেরা কি করে চুরী করবে? ব্যাটারা কি তবে না খেয়ে মরবে?

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে চোর বজরঙ সিং-এর বাড়ীতে গিয়ে উঠল। বজরঙ সিং কারবার করে অনেক পয়সা ঘরে আনে। কিছু কি আর মিলবে না? কিন্তু তার বাড়ীর সীমানায় যেই না পা দিয়েছে, অমনি ওরে বাবা, বিরাট এক ডালকুত্তা সাঁ সাঁ করে তেড়ে এল। দূর থেকে দেখা গেল ওর চোখ দুটো জ্বলছে। এক বার ধরতে পারলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ছুট্

ছুট্ ছুট্ চোর এমন ছুট জীবনে আর কখনও দেয়নি। উঃ একটুকুর জন্য বড় বেঁচে গিয়েছে।

হায়, হায়, রাত যে আর বেশী নেই! সারা রাত ভর মেহনতের পর শেষে কি খালি হাতেই ঘরে ফিরে যেতে হবে? এখন আর সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকবার সময় নেই। তবে সে কি করবে? একেবারে খালি হাতে যে চোর ঘরে ফিরে আসে, তার ঘরে কি কোন লক্ষ্মী থাকে? কালু মিয়ার কুঁড়ে ঘরটার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে দেখল, উঠানের ধারে ভাংগা বদনাটা পড়ে আছে। নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল। বদনাটাই তুলে নিল সে। কিন্তু যেই না তুলে নিয়েছে, অমনি বদনাটা "চোর চোর" বলে চেঁচিয়ে উঠল। বদনাটা যে চেঁচাচ্ছে চোর তা কেমন করে বুঝবে! সে আর কোন দিন কোন বদনাকে কথা বলতে শোনেনি। সে ভাবল তাকে দেখতে পেয়ে ঘরের লোকগুলিই বুঝি চেঁচিয়ে উঠেছে। সে আবার ছুটল, যত জোরে পারে ছুটল, বদনাটাকে কিন্তু ছাড়ল না। বদনা চেঁচাতে লাগল "চোর চোর" আর চোর ভাবল ওরা বুঝি তাকে তাড়া করে আসছে। ভয়ে সে প্রাণ পণ ছুটতে লাগল।

অবশেষে একটা জঙ্গলের মধ্যে এসে একটা ঝোপের ধারে বসে হাঁপাতে লাগল সে। বদনাটা ভাবল এখন আর "চোর চোর" বলে চেঁচানটা ঠিক হবে না। কি জানি যদি ঘাড়টা মটকে দেয়! নেহাৎ গোবেচারা ভাল মানুষের মত সে চুপ করে রইল। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারল না। কেমন করে পারবে? সে চমকে উঠে চেয়ে দেখল, চোরটা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে, তার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বদনা আর চুপ করে থাকতে পারল না।

সে বলল, তুমি কেমন চোর গো?

চোর চমকে উঠে চারদিকে চেয়ে দেখল, কে কথা বলছে। বদনা বলল, আমি গো আমি, এই যে তোমার হাতে। আমি

কালু মিয়ার বদনা।

চোর আর তার জীবনে এমন কাণ্ড কখনও দেখেনি। বদনারা আবার কথা বলতে পারে নাকি? কিন্তু বলছে যখন, শোনাই যাক। সে বলল, তুমি আবার কি বলছ?

বদনা বলল, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কেমন চোর গো? চোরেরা কি কখনও কাঁদে? এক কাঁদে যখন ধরা পড়ে মার খায়। তা ছাড়া আর কখনও কাঁদে না।

কাঁদে না? কেউ না? তুমি তো বদনা। চোরের খবর তুমি কেমন করে জানবে?

না: চোরের খবর আমি জানি না, তুমি আমাকে চোর দেখাবে! না হয় বদনাই আছি, তাই বলে আমি কি আজকের মানুষ? আমি কালু মিয়াদের ঘরে তিন পুরুষ ধরে আছি। দেখ না, বুড়ো হয়ে আমার গা-গতর খসে গেছে। আমি ঢের ঢের চোর দেখেছি। কিন্তু তোমার মত চোর আমি কখনও দেখিনি। এর নাম চোর।

চোরের মনটা বেজায় হয়ে গেল। সে বলল, কেন, কি হয়েছে? আমাকে চোরের মত দেখাচ্ছে না?

তখন অন্ধকার কেটে চার দিক আলো হয়ে গিয়েছে। বদনা এবার পরিষ্কার ভাবে সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। সে বলল, তোমার চেহারা এমন কাঠি কাঠি কেন? ও মা সবগুলো হাড়ই যে বেরিয়ে পড়েছে। তুমি ভাত খাও না?

চোর বলল, খাই। তবে দু'এক দিন বাদে বাদে। আর যখন খাই, তখন পেট ভরে খেতে পারি না।

কেন, মুখে রুচি নেই বুঝি?

রুচি? না না, রুচি খুবই আছে। আমার পেটে বেজায় খিদে। কিন্তু টাকা নেই যে। ঘরে বউটা পয়সাহীন, বেশী দিন আর বাঁচবে না। ছেলে মেয়ে দুটোও অসুখে ভুগে ভুগে কাঙালপাল হয়ে উঠেছে। এখন ওদের দিকেই তাকাব না নিজের পেটকে পুরে দেব? বলে সবাই

মিলে কষ্ট পাই। মরিও না, তরিও না, এই এক অবস্থা।

বদনা বলল, আহা, কেন, চুরী করে টাকা পাও না?

চোর বলল, লোকগুলো আজকাল বড় বেশী হুঁশিয়ার হয়ে পড়েছে। দেখ না সারা রাত কত মেহনত করলাম, কিন্তু সব বৃথা। এখন তোমাকে নিয়ে বাজারে গেলে কেউ চারটে পয়সাও দিতে চাইবে না।

তা চুরীতে যদি না পোষায়, ডাকাতি করলেই পার।

ডাকাতি? ও আমার অভ্যেস নেই। তা ছাড়া বড় ভয় করে।

বদনা এবার একটু তেতে উঠে বলল, তা এতই যদি ভয়, তবে এ সবে কি দরকার ছিল? ভাল মানুষ হয়ে থাকলেই পারতে? চাষবাস করে সুখে ঘর সংসার করলেই হোত।

তাতেও সুখ নেই রে ভাই। আমার বাপ ভাল মানুষ ছিল, চাষবাস করত। দিন রাত্রি খেটে মরত। কিন্তু সেও তো না খেয়ে খেয়ে মরে গেল

বদনা এত সব কথা জানত না। সে হতাশ হয়ে বলল, তবে তুমি কি করবে এখন?

চোর বলল, সেই কথাই তো ভাবছি। আর ভাবছি, এখন আমি ঘরে গিয়ে বউকে কি বলব। বউ আর ছেলে মেয়ে দুটো তো আমার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে।

এই বলেই চোর আবার ফোঁস ফোঁস করে উঠল।

হঠাৎ চোর আর বদনা একই সংগে চমকে উঠে চেয়ে দেখল কালু মিয়া আর ক'জন লোক তাদের ঘিরে ফেলেছে। ওদের সবার হাতেই লাঠি। কালু মিয়া হেঁকে উঠল, এই যে আমার বদনাটা। আমাদের তিন পুরুষের বদনা। ব্যাটা আমার সেই বদনাটা চুরী করে পালিয়েছে। এই বার পেয়েছি ব্যাটাকে, ধর তো।

চোর ভয়ে চার দিকে তাকিয়ে দেখল, পালাবার কোন পথ নেই। লোকগুলো মার মার করে তার উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বদনাটা কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, ওগো তোমরা ওকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ওর বউ আর ছেলে মেয়েরা যে ওর আশায় বসে আছে।

কিন্তু তার কোন কথা কারু কানে গেল না।

শক্তের ভক্ত

রাত্রি বাজে নটা। ডাক্তার বাবু তার ডাক্তার খানায় বসে আছেন। মেজাজটা বিশেষ ভাল নয়। সেই কখন থেকে বসে আছেন, একটা রুগীও আসে না। আজ হোল কি? দেশে রোগ সোগ সব দূর হয়ে গেল নাকি?

অবশেষে একজন দেখা দিল। ডাক্তার বাবু একটু তাজা হয়ে উঠে বসলেন। কিন্তু সে লোক যখন ঘরে এসে ঢুকল, তাকে দেখেই ডাক্তার বাবুর মনটা বিগড়ে গেল। লোক নয়, মেয়ে লোক—ও পাড়ার কেলোর মা। গরীবের বেহদ্দ। একটা পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই।

কেলোর মা ঘরে ঢুকেই একেবারে কেঁদে পড়ল, ডাক্তার বাবু গো, আমার কেলোর জ্বর যে কেরমেই বেড়ে চলেছে। কেমন যে করছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। আপনি একবার চল।

ডাক্তার বাবু মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, এঃ একটা পয়সা দেবার নাম নেই, উনি এসেছেন ডাক্তার ডাকতে। যা যা, আমি যেতে পারব না।

কেলোর মা এবার তার আঁচলের তলা থেকে একটা শিশি বের করে বলল, তবে আপনি একটু ওষুধই দিয়ে দাও।

পাঁচ আনা পয়সা লাগবে। দিতে পারবি?

পাঁচ আনা কি গো! আমার যে পাঁচটা পয়সা ঘরে নেই। আপনি এখন এমনিতেই দিয়ে দাও। আমার কেলো সেরে উঠুক, ও আপনার পয়সা শোধ করে দেবে।

ভাগ্, আমি বিনি পয়সায় ওষুধ দিতে পারব না।

কেলোর মা ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারল, সুবিধা হবে না। সে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকেছিল, কাঁদতে কাঁদতেই বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু বসেই রইলেন, কিন্তু আর কেউ আসে না। দেয়াল ঘড়ীতে টং করে সাড়ে নটা বাজল। এমন সময় কেমন বিচ্ছিরি একটা জালা আর বোঁটকা গন্ধ পেয়ে ডাক্তার বাবু নাক সিঁটকে বললেন: রামো, কি যেন পচেছে। আর তখুনি কে যেন হেঁড়ে গলায় ডেকে উঠল, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার বাবু ডাক শুনে চমকে উঠে চেয়ে দেখেন, টেবিলের সামনে একটা কি যেন বসে আছে। ও কি রে বাবা! তার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল। বাতিটা উস্‌কে দিতেই একেবারে চোখে চোখ মিলে গেল। এঁ্যা, এ যে মস্ত বড় একটা বাঘ। একেবারে আসল বাঘ। এই এত্ত বড় একটা মাথা। ভাঁটার মত চোখ দুটো। আর ইয়া লম্বা লম্বা গোঁফ। ডাক্তারবাবু আঁতকে উঠে আঁউ আঁউ করতে লাগলেন।

বাঘ বলল, ডাক্তারবাবু, ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে কিছু বলব না। আমি যে তোমার রুগী।

বাঘের মুখে দিব্যি মানুষের মত কথা শুনে ডাক্তরবাবুর সাহস একটু ফিরে এলো। বুকের ধড়ফড়ানিটা একটু সামলে নিয়ে তিনি বললেন, রুগী! বাঘ আবার কখনও রুগী হয় নাকি? রোগ তো হয় মানুষের।

বাঘ বলল, তুমি সত্যি কথাই বলেছ। আগে নিয়ম তাই ছিল বটে। কিন্তু এখন দিন বদলে গেছে। বুড়োদের মুখে শুনেছি, তাদের সময় মানুষগুলি সুস্থ সবল ছিল। তাদের খেলে পরে কিছু হোত না। কিন্তু এখনকার মানুষ একেবারে রোগের বাসা। এখন যে সব বাঘ মানুষ খায়, তাদের কারু স্বাস্থ্যই ভাল নয়। একটা না একটা গোলমাল আছেই। আমার অবস্থাটাই দেখ না।

কি হয়েছে তোমার?

কি হয়েছে? কি হয়েছে কেমন করে বলব, সে তোমরা ডাক্তার-রাই জান। পেটে বিষম কামড়ানি। একটু কিছু খেয়েছি কি

নয়নি, ওরে বাবা, সে কি যন্ত্রণা। তখন আর চুপ করে থাকতে পারি না। কেঁদে-কেটে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে সবাইকে পাগল করে তুলি। বাঘিনী রোজই বলে তুমি একবার ডাক্তারের কাছে যাও। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে তোমার কাছেই এলাম। ডাক্তারবাবু, আমাকে একটু ভাল দেখে ওষুধ দিয়ে দাও।

কথা বলতে বলতে ডাক্তারবাবুর ডর ভয় তখন একদম চলে গেছে। তিনি বললেন, ওষুধ আমি দিতে পারি, কিন্তু আমরা তো টাকা পয়সা ছাড়া চিকিৎসা করতে পারি না। এই তো আমাদের ব্যবসা।

বাঘ বলল, সে তো ঠিকই। তুমি আমার বেদনাটা সারিয়ে দাও, আমি তোমাকে খুশী করে দেব। কত পয়সা তুমি চাও?

ডাক্তার হেসে বললেন, হ্যাঁ, কাজের নামে কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। অমন কথা অনেকেই বলে। শেষে কারু টিকিটিও দেখা যায় না। বিশেষ করে বাঘদের কথা।

কেন, বাঘেরা আবার কি দোষ করল? বাঘ গম্ভীর সুরে বলল।

বেশ, শোননি সেই বাঘ আর বকের কথা?

কই, না তো।

তবে শোন। এক বাঘের গলায় একটা হাড় ফুটেছিল। সে বাঘ তোমারই মত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চেঁচাতে লাগল, যে আমার এই গলার হাড় খুলে দিতে পারবে, তাকে অনেক পুরস্কার দেব। কিন্তু কেউ ভয়ে এগোয় না। শেষ কালে এক লোভী বক পুরস্কারের লোভ সামলাতে না পেরে পা টিপে টিপে সামনে এসে বলল, হুজুর, একটু হাঁ করুন তো, আমি একটু চেষ্টা করে দেখি। বাঘ চোখ বুজে বিরাট এক হাঁ করল।

বক তার লম্বা ঠোঁটটা তার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে খুট্-করে হাড়টা বের করে নিয়ে এল। বাঘ আরামের নিশ্বাস ফেলে বলল—আঃ।

তখন বক বলল, হুজুর, কাজতো করলাম, এবার আমার পুরস্কার ?

বকের এই কথা না শুনে বাঘ কিন্তু চোখ লাল করে উঠল, বটে, বাঘের গলার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে সেই মাথা বের করে নিয়ে আসতে পেরেছিস, এই তো তোর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য। এর পরেও আবার পুরস্কার চাইছিস্ ! পালা ব্যাটা।

বেচারা বক কি আর করবে, প্রাণ নিয়ে পালাল।

কিন্তু বাঘ, তোমার এত বয়স হয়েছে, এই ঘটনাটা শোননি ?

বাঘ বলল, না, আমি এমন কথা কখনই শুনিনি।

আশ্চর্য ! অথচ একথা তো সবাই জানে। আমাদের ঘরের এইটুকুন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও তো এ কথা জানে।

বাঘ বলল, এসব মানুষদের বানানো কথা। বাঘদের নিন্দা করবার জন্যই তারা এ সমস্ত মিথ্যে কথা তৈরী করেছে।

আরে না না, মিথ্যে গল্প নয়। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কথামালা বইতে এই কাহিনী লিখে গেছেন। তিনি তো মহাপুরুষ, তিনি কি আর মিথ্যে কথা বলতে পারেন ? শোননি তাঁর নাম ?

উঁহুঃ, কে সেই লোকটা ?

তাও জান না। তিনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামের ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।

বাঘ বলল, তা হোক, তবু সে সেরেফ মিথ্যে কথাই বলেছে। তুমি চল আমার সংগে, আমি সমস্ত বাঘদের এক জায়গায় জমায়েত করে তোমার সামনে তাদের কাছেই কথাটা জিগ্যেস করব। সত্যি হয়ে থাকলে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বলতে পারবে।

ওরে বাবা, ওখানে যাবে কে মরতে !

বাঘ উকীলদের মত ভাল জেরা করতে পারে। সে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, তোমরা কোন বকের কাছে জিগ্যেস করে দেখেছ ?

হ্যাঃ, বকেরা কি কোন খবর রাখে নাকি ? ওদের কাছে জিগ্যেস করাও যা, না করাও তা।

বেশ কথা। ঘটনাটা ঘটল বাঘ আর বকের মধ্যে। তাদের তোমরা কেউ কিছু জিগ্যেস করলে না। তবে তোমরা কেমন করে জানলে? সেই ঘটনা ঘটবার সময় কোন মানুষ উপস্থিত ছিল সেখানে? এমন কথা তোমাদের সেই বইতে লেখা আছে?

ডাক্তারবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, না, তা অবশ্যই নেই।

তা হলে?

ডাক্তারবাবু এবার বেশ বিপদেই পড়ে গেলেন। কি বলবেন এখন? একটু আমতা আমতা করে বললেন, হয় তো কোন শিকারী ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, হয়তো গাছের উপর কেউ বসে ছিল, হয়তো—

বাঘ এবার বদমেজাজী হাকিমের মত ধমক দিয়ে উঠল, ধেত্তেরি, কেবল হয়তো আর হয়তো আর হয়তো। যত সব বাজে কথা। এখন শোন ডাক্তারবাবু ওসব বাজে কথা রাখো। যদি ঐ রোগ সারাতে পার, তোমাকে অনেক টাকা দেব।

ডাক্তারবাবুর মেজাজটাও খুব ভাল নয় তো, ধমক খেয়ে তিনিও চটে উঠলেন। তিনিও তাঁর গোঁ ছাড়তে চাইলেন না। বললেন, হ্যাঁঃ, সেরে গেলে টাকা দেব, এতো অনেক ব্যাটাই বলে। কিন্তু সারবার পরে আর কারু পাত্তা পাওয়া যায় না। সব ফাঁকিবাজ।

কি আমরা ফাঁকিবাজ! বাঘ এবার বাঘের মতই গর্জন করে উঠল, বাঘেরা কোন দিনই মানুষের মত মিথ্যাবাদী নয়। ডাক্তার বাবু, তোমায় মিষ্টি করে বললাম, ভাল কথায় বললাম, তবু তুমি শুনছ না। এবন শেষ বারের মত বলছি, ওষুধ দাও। ভাল চাও তো দাও, নইলে এক চাঁটি মেরে তোমার মাথার চাঁদি উড়িয়ে দেব। বুঝলে?

ওরে বাবা, বাঘের সে কি মূর্তি। তার চোখ দুটো আগুনের মত ধক ধক করে জ্বলছে। ডাক্তারবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, এই যে, দিচ্ছি দিচ্ছি। আমি তো দিতেই যাচ্ছিলাম।

হ্যাঁ, লক্ষ্মী ছেলের মত দিয়ে দাও। আর শোন, তোমরা মানুষ শয়তানীর রাজা। যদি ওষুধের সংগে কোন রকম বিষ-টিস মিশিয়ে দাও, তবে বাঘিনী রইল, সেই তোমার সংগে বুঝ ব্যবস্থা করবে।

ডাক্তারবাবু আশ্চর্য হয়ে মনে মনে ভাবলেন, আমার মনের কথাটা এ কেমন করে টের পেয়ে গেল!

আর মুখে বললেন, না না না, সে কি কথা, একজন ডাক্তার কি কখনও এমন কাজ করতে পারে? তা যা হয়ে গেছে হয়েই গেছে, কিছু মনে রেখো না।

বাঘ গোঁফের ভিতর দিয়ে মুচকি হাসি হেসে বলল, মনে আবার রাখব না! ওই মেয়েটাকে তুমি ওষুধ দিলে না, ও কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল, ওই এখানে বসে তাও আমি দেখেছি। মানুষ জাতটাকে আজ ভাল করেই চিনলাম। তোমরা শক্তের ভক্ত নরমের যম।

ভাই ভাই

মাছের রাজা রাঘব বোয়াল। রাজার মত রাজা। যেমন নাম তেমন কাম। নদীর যত মাছ সব তার প্রজা। তার কথায় ওঠে বসে।

এ হেন রাজা রাঘব বোয়াল, তার মা গেল মারা। মা থাকলে মা মরবেই। যার মা নেই, একমাত্র তারই মা মরে না। সবাই এই বলে রাজাকে সান্ত্বনা দিল। রাজা বললেন, মায়ের শ্রাদ্ধে এমন খাওয়া খাওয়াও, যা কেউ জন্মে দেখেনি। আমি রাজা, আমার কাছে বড় ছোট ধনী গরীব ভেদ নেই। আমি সবাইকে নেমন্তন্ন দেব। রাজ্যের এক দিক থেকে আর এক দিক পর্যন্ত ঢোল পড়ল।

শোন শোন মৎস্যগণ করি নিবেদন
রাজ জননীর হইল পরলোক গমন (ঢ্যান্ ঢ্যান্ ঢ্যান্ ঢ্যান্)
তার স্বর্গ কামনায় ভোজন উৎসব (ঢ্যান্ ঢ্যান্)
বড় ছোট ভেদ নাই, চলে এসো সব। (ঢ্যান্ ঢ্যান্)
আবাল বনিতা বৃদ্ধ সবাই আসিবে
যার যতদূর শক্তি উদরে ঠাসিবে। (ঢ্যান্ ঢ্যান্ ঢ্যান্ ঢ্যান্ ঢ্যান্ ঢ্যান্।)

এমন আরও অনেক ভাল ভাল কথা তারা বলল। সমস্ত রাজ্যে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। সবাই বলল, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে এ্যায়সা কাম কোই নেই কিয়া। আপতো রাজ চক্রবর্তী হেঁয়। মা বাপ তো কত জনারই মরে। কিন্তু মার জন্য এমন কে করে? রাজা শুনে মহাখুশী।

৪ঠা আশ্বিন, মঙ্গলবার। দলে দলে মাছ আসতে লাগল। যেখানে যে ছিল কেউ বাদ পড়ল না।

রুহিত কাতল আইড় ভেট্‌কি চিতল
ইলিশ খলিশা কই চলে দলে দল।
পুঁটি, চাদা কাচ্‌কিরা কাতারে কাতার
বেঁহুশ হইয়া সবে মারিল সাঁতার।

কারু আজ ভয় নেই। রাজার হুকুম জারী করা আছে। আজকের দিনের জন্য কোন মাছ কোন মাছকে খেতে পারবে না, কামড়াতে পারবে না, এমন কি চুঁটাও মারতে পারবে না। আজ সব মাছ ভাই ভাই।

বড় খানা কিনা, খেতে অনেক দেরী হবে। তাই সবাই দল বেঁধে জটলা করছে। সমাজের এতবড় মেলা আর কোন দিন তো বসেনি। বড় আনন্দের দিন। রুই মাছ পুঁটি মাছের গা ঘেঁষে বলে, কি ভাই কেমন আছ? পুঁটির বুকটা ধুক পুক করতে থাকে। কিন্তু না, আজ কোন ভয় নেই। পুঁটি কোন মতে ঢোক গিলে নিয়ে বলে, ভাল আছি রুইদা, তুমি ভাল তো? বউদির খবর ভাল?

রুইর জিভের জল টস্‌ টস্‌ করে পড়তে থাকে, তবু কোন মতে সামলে রাখে। আজ যে অহিংসা আর ভালবাসার দিন।

গলদা চিংড়ীদের জওয়ান ছেলেটার কানেও নেমন্তন্নের খবর গিয়ে পৌঁছেচে। সে স্বকর্ণে ঢোলের বাড়ি শুনেছে। সব মাছেরই যখন নেমন্তন্ন, চিংড়ীমাছই বা বাদ পড়বে কেন? ছেলেটা বড় পেটুক, নেমন্তন্নের গন্ধ পেয়ে বাড়ার সবাইকে কোন কথা না বলে সোজা চলে এসেছে। সে যখন তার লম্বা লম্বা পা ফেলে আসরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে মাছদের মাঝে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল। এমন বিদঘুটে মূর্তি দেখে মাছদের ছানারা মায়ের পেটের তলায় সেঁদিয়ে পড়ল। তার দিকে তাকিয়ে কেউ বলল, এটাকে,

চিনি না তো। কেউ বলল চিংড়ী, কেউ বলল চিংড়ী মাছ, কেউ বলল ইচা। নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল। তবে মাছদের মধ্যে বাজু যারা, তারা ওর নাম ধাম বংশ পরিচয় সব কিছুই জানে।

এই রকম একজন প্রাচীন মুরুব্বীমত মাছ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে হে? মাছের বাড়ীর নেমন্তন্নে তুমি কেন? তোমাকে কে ডেকেছে?

ছোকরা চটপট জবাব দিল, আমি? আমি চিংড়ী মাছ গো। কে ডেকেছে মানে? তোমরাই তো ঢোল দিলে, ছোট বড় ভেদ নেই, সব মাছের নেমন্তন্ন। তাই তো আমি এলাম।

তোমার পদবী?

গলদা।

হুঁ, কিন্তু তুমি যে মাছ, এ কথা কে তোমাকে বলেছে?

আরে, কে আবার বলবে। কার নাম করব? চিংড়ী মাছকে সবাই চিংড়ী মাছই বলে থাকে।

যারা বলে তারা ভুল করে বলে। চিংড়ী মোটে মাছই নয়।

ছোকরা এবার একটু চটে উঠল, না চিংড়ী মাছ মাছ নয়, যত মাছ সব তোমরাই। চিংড়ী মাছ মাছ নয়, তবে সে কি?

চিংড়ী? ও এক রকম জলের পোকা। কি চেহারায়, কি চাল চলনে, কি ক্রিয়া কর্মে, কি আচার ব্যবহারে, কোন দিক দিয়েই তোমরা মাছদের মত নও।

গলদা বাড়ীর ছোকরাটা বড় তর্ক করতে ওস্তাদ। প্রবীণ মাছটির সে কথা জানা ছিল না। জানলে হয় তো তাকে ঘাঁটাতে চাইত না।

ছোকরা বলল, বেশ কথা। মাছের লক্ষণ কি বল দেখি? কি হলে তাকে মাছ বলবে?

মুরুব্বী এবার একটু বিপদে পড়ে গেল। এ কথাটা নিয়ে তো আর কখনও ভেবে দেখেনি। এখন চটপট করে এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে? কিন্তু এ পাশে ও পাশে বহু মাছ এই আলোচনা শুনবার

জন্য জড় হয়েছে। তাদের সামনে এই ছোকরার কাছে কিছুতেই সে হটে যাওয়া চলে না। সে বলল, মাছেরা বুকে চলে।

ছোকরা হেসে বলল, বুকে চলে! সাপও তো বুকে চলে, তাই বলে সাপ কি মাছ?

উপস্থিত মাছেরা এক বাক্যে উত্তর দিল না, সাপ কখনও মাছ নয়।

তারপর এই ভাবে তর্কাতর্কি চলতে লাগল।

মাছদের পাখনা আছে। চিংড়ীর তা নেই।

পাখীদেরও তো পাখনা থাকে। তাই বলে পাখী কি মাছ?

সবাই একবাক্যে উত্তর দিল, না, পাখী কখনও মাছ নয়।

তোমাদের চিংড়ীদের গায়ে আঁশ নেই। মাছের গায়ে আঁশ থাকে।

তাই নাকি? তোমাদের রাজা বোয়ালের গা খুঁজে আঁশ বার কর দেখি।

আমরা মাছেরা লেজের জোরে সাঁতার কাটি।

গোসাপও লেজের জোরে সাঁতার কাটে। কুমীরও তাই। তাই বলে ওরা কি মাছ?

সবাই মাথানেড়ে বলল, ঠিক কথা। গোসাপ বা কুমীর কখনও মাছ নয়। তোমাদের মত মাছদের এই বিচ্ছিরি দাড়ি-গোঁফ থাকে না।

কে বলল থাকে না? মিথ্যে কথা। তোমাদের তপ্‌সেকে একবার ডেকে নিয়ে এস না।

কিন্তু তপ্‌সেকে তখন কোথায় পাবে। সে বড় হুঁশিয়ার। মুরুব্বীর দাড়ি-গোঁফের প্রশ্নটা শুনেই সে চটপট এক দিকে সরে পড়েছে।

মুরুব্বী এবার ক্লান্ত হয়ে থামল। কিন্তু শ্রোতারা খুবই আগ্রহের সংগে মন দিয়ে শুনছিল। তারা বলে উঠল, আহা, আরও একটু সময় চলুক না, এখনই থামিয়ে দিলে কেন? খাওয়ার তো আরও দেরী আছে, ততক্ষণ চালিয়ে যাও।

কিন্তু মুরুব্বী মুখখানাকে হাঁড়ীর মত করে বলল, যত সব কচকে ছোঁড়ার কারবার। এদের সংগে কথা বলাই অন্যায়। এই বলে সে গনগন করতে করতে রান্নার কত দেরী আছে দেখতে গেল।

শ্রোতার দল তখন গলদা চিংড়ীকে ঘেরাও করে ধরে বলল, দাদা, ওসব বুড়ো-ধুড়ো গোসাপের কথা বাদ দাও। তোমার কথাগুলি শুনতে বড় ভাল। যা বলছিলে, আরও কিছু বল না। ওদিকে রান্নার এখনও নাকি অনেক বাকী।

ছোকরা বলল, কি বলব? প্রশ্ন কর, উত্তর দিচ্ছি।

তবে কি তোমাদের সংগে আমাদের কোনই তফাৎ নাই?

তফাৎ থাকবে না কেন? সকলের সংগেই সকলের তফাৎ আছে। বোয়াল মাছ আর পুঁটি মাছ কি এক রকম? অথচ মাছ তো দুজনেই। ঠিক সেই রকম তোমাদের সংগে আমাদের ক্রিয়া-কর্মে, আচার-ব্যবহারে অনেক তফাৎ। এর কারণ কি জান? আমরা চিংড়ী মাছরা সভ-ভব্য হয়েছি। আর তোমরা এখনও সেই বর্বর যুগেই পড়ে আছ।

এই কথা বলা মাত্র শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই বিষম গরম হয়ে উঠল,। কয়েকজন লাফিয়ে উঠে বলল, কি এত বড় আস্পর্ধা —আমরা বর্বর?

ছোকরা শান্ত কণ্ঠে বলল, এই জন্যই তো তোমাদের কাছে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করে না। কথায় কথায় এত গরম হয়ে উঠলে কি চলে?

উপস্থিত মাছদের মধ্যে একটু ঠাণ্ডা আর ধীর স্থির প্রকৃতির যারা, তারা গোলমালটা থামিয়ে দিয়ে ছোকরাকে বলল, কিন্তু একটা কথা বললেই তো হল না। তোমার কথাটা বুঝিয়ে বল, প্রমাণ করে দেখাও।

নিশ্চয়ই প্রমাণ করে দেখাব। আমাদের স্বভাব আর তোমাদের স্বভাব একবার তুলনা করে দেখ। তোমাদের মধ্যে বড় মাছরা

ছোট মাছদের ধরে ধরে খায়। কেন, ছোট বলে সে কি মাছ নয়? তার কি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে সাধ হয় না? আজ এই একটা উচ্ছবের দিনে তোমরা সবাই একসংগে কেমন সুন্দর মেলামেশা করচ। কী সুন্দর ভাই ভাই ভাব! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যায় কিনা, তোমরাই বল না?

অনেকেই এ কথায় সাড়া দিয়ে বলল, তা তো ঠিক কথাই। কিন্তু কাল? কাল কি হবে? ভোর হতে না হতেই এক জন আর এক জনের পিছনে ঘাড় ভাংগতে ছুটবে। একি রাক্ষুসে কারবার, বল দেখি? আর আমাদের ওখানে গিয়ে দেখ। চিংড়ী মাছদের মধ্যে এসব নেই। গলদা, বাগদা থেকে কুচোচিংড়ী পর্যন্ত সবাই মিলে মিশে থাকে, কেউ কাউকে হিংসে করে না। তোমরাই বল কোনটা ভাল?

ছোকরার এই কথাটা ছোট মাছদের মধ্যে অনেককেই ভাবিয়ে তুলল। কথাটা তো মিথ্যে নয়। তা ছাড়া মাছেদের জীবনে এ যে জীবন-মরণ সমস্যা। কাজেই কথাটা ছাড়া মাত্রই সবাই এই নিয়ে আলোচনায় মত্ত হয়ে উঠল। আলোচনা থেকে তর্কাতর্কি। ছোট মাছেরা সবাই বলল, ঠিকই তো বলেছে কথা। ভাই হয়ে ভাইকে খাওয়া এটা কি ভাইয়ের মত কাজ হল? বড় মাছরা বলল, যার যা খাদ্য সে তা খাবেই। এটা ভগবানেরই বিধান। তার মধ্যে দোষের কথা কি আছে?

এই নিয়ে দু পক্ষে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। তর্কাতর্কি থেকে শেষে ঠুকা ঠুকি। হাত তো নেই, থাকলে হাতাহাতিও করত। ছোট মাছগুলিও যেন, মরিয়া হয়ে গিয়েছিল, তারাও ছেড়ে কথা কইল না, হাজার হাজার ছোট মাছ এক কাট্টা হয়ে লেগে গেল। ও দিকে বড় মাছগুলির ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। সামনে এত খাবার মজুত দেখে ওরাও একদম বেহুঁশ হয়ে গেল। রাজার আদেশ ভুলে গিয়ে ওরা টপাটপ ছোট মাছগুলিকে গিলতে লাগল।

রাজার মার শ্রাদ্ধের ভোজন উৎসব শুরু হয়ে গেল।

সংবাদ গিয়ে পৌঁছল রাজার কাছে। রাজা এমনিতে শান্ত, কিন্তু চটলে একেবারে আগুন। হুকুম দিলেন, সব ব্যাটাদের পিটাও। আর কি কথা আছে। সংগে সংগে রাজার সৈন্যেরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বড় ছোট ভেদ না করে সবাইকে পিটোতে লাগল। ওরে বাপরে বাপ, সে কি পিটুনি। সব কিছু ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পর দেখা গেল নেমন্তন্ন খেতে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে প্রায় সবাই পালিয়েছে, কিছু সংখ্যক হতাহত হয়ে পড়ে আছে।

দাংগার তদন্ত বসল। সেই উপলক্ষে খোঁজ পড়ল সেই গলদা চিংড়ীর। খোঁজ খোঁজ, কোথায় গেল সে। কিন্তু তার খোঁজ আর তখন কেমন করে পাওয়া যাবে? সে যে তখন তার নিজের ঘরে ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং রেখে মনের আনন্দে বউয়ের কাছে এই গল্পই বলছে।

এটম বোম

শেয়ালনী ও শেয়ালনী, আঃ হা, কোথায় গেলে তুমি? শেয়াল গর্তে ঢুকেই হাঁকা-হাকি ডাকা-ডাকি শুরু করে দিয়েছে।

শেয়ালনী তার ছানাগুলিকে আদর করছিল। শেয়ালের এত হাঁক ডাক শুনে আর বসে থাকতে পারল না। ওদের কোন রকমে ঠেলে ঠুলে সরিয়ে দিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটে এল। কিন্তু সবচেয়ে ছোটটা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত, বিষম নাছোড়বান্দা। সে মায়ের ঘাড়ে শক্ত করে কামড়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতে আর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলে এল।

মা বাচ্চাটার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বলল, দেখেছ পাজির কাণ্ডটা।

শেয়াল বলল, ব্যাটা এক নম্বরের বদমাইস হবে।

হ্যাঁ, বাপের মতই হবে। কিন্তু আমাকে অমন করে ডাকছিলে কেন গো তুমি? হয়েছে কি? শেয়ালনী জিগ্যেস করল।

মা বাপের মন! বাচ্চাটাকে দেখে শেয়াল তার আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিল। অথচ এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই ছুটে এসেছে। শেয়ালনীকে না বলা পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

বিষম কাণ্ড! লণ্ড ভণ্ড ব্যাপার। তুমি তো কিছুই খবর রাখ না, ওদিকে যে কত কি সব হতে চলেছে। তুমি তো ঘরের কোণে বসেই দিন কাটাও। দিন দিন একেবারে মেয়ে মানুষদের মতই হয়ে যাচ্ছ।

শেয়ালনী শেয়ালের কথায় দস্তুর মত চটে উঠল, তোমার কি, তুমি তো বাপ হয়ে খালাস। আর এই চার চারটাকে নিয়ে যত

ভোগ ভোগান্তি সব আমার কপালে। দিন রাত্তির এই শত্তুরগুলি আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমার মরবার সময় নেই, আমি বাইরে যাই কখন? তুমি আবার এর উপর ফোড়ন দিতে এস না।

শেয়াল বুঝল, কথাটা খারাপই হয়ে গেছে। শেয়ালনীকে ঠাণ্ডা করবার জন্য সে তার সারা গায়ে তার লেজটা বুলিয়ে দিয়ে বলল, আহা অত রাগ কর কেন? আমি বললাম একটা কথার কথা। সব কথা কি অমন করে গায়ে মাখতে আছে? আর তুমি যে 'বাপ' বলে আমার উপর ঠেস দিয়ে কথা বলছ। আমি কি করব বল? আমি কি ওদের পালতে পারি? সেই ক্ষমতা কি আমার আছে?

শেয়ালনী খুব রাগ করেছিল কিনা, তাই মুখখনা বিষম গম্ভীর করেছিল। কিন্তু শেয়ালের কথাটা শুনে আর থাকতে পারল না, ফিক করে হেসে ফেলল। তারপর বলল, থাক আর অত কথার কাজ নেই। তুমি তো শেয়াল পণ্ডিত, কথার সাগর, তোমার সংগে কি আমি কথায় পারব? এখন কি বলছিলে, তাই বল। এসেই কি হাঁক ডাক—ভাবলাম প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল বুঝি।

আরে, মহা মজার ব্যাপার—যুদ্ধ লাগবে শেয়ালনী—যুদ্ধ।

যুদ্ধ? কাদের যুদ্ধ গো? তুমি কিন্তু ওসবের মধ্যে থাকতে পারবে না আগেই বলে রাখছি। তোমার কি, একটা হুজুক পেলেই হোল। মস্ত বীরপুরুষ তো।

আরে পাগল, আমার কোন কাম যুদ্ধে গিয়ে? মানুষে মানুষে যুদ্ধ।

আহা এ আবার একটা নতুন কথা কি? ওরা তো সব সময়ই যুদ্ধ করছে। ওরা কি যুদ্ধ ছাড়া থাকতে পারে নাকি? যার যেমন স্বভাব।

আরে না না তা নয়, সে যুদ্ধ নয়। এতদিন যুদ্ধ গেছে শুধু ফাট্‌ফুট। এবার তা নয়। এবার এটম বোমা দিয়ে যুদ্ধ। এবার আর কারু রক্ষা নেই।

এটম বোমা কি গো ?

এটম বোমা ? হায়রে কপাল, তাও জান না ? এ এক বিষম অস্তর। অনেক মাথা খাটিয়ে বার করেছে মানুষ। এই অস্তর দুপক্ষে দু পক্ষের দিকে তাক করে ছাড়বে। আর সংগে সংগেই সব খতম। একটি মানুষও বেঁচে থাকবে না।

এমন বুদ্ধি না হলে শিয়ালপণ্ডিত বলবে কেন ? কার মুখে কি শোন, আর তাই শুনে আন্দাজে মান্দাজে লাফাও। সব মানুষ মরতে যাবে কিসের জন্যে ? যদি মরেই, যারা যুদ্ধে যাবে তারা মরবে। যারা ঘরে বসে থাকবে তাদের কি ?

আরে বাবা এ তেমনি অস্তর কিনা। এ যে ঘড়বাড়ীশুদ্ধ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। যার নাম এটম বোমা।

তাই যদি হয়, তবে আমরাশুদ্ধ তো মরব।

না না, আমরা মরব কেন ? আমরা থাকব জংগলে আর মাটির তলায়।

মানুষ বড় হিসাবী গো, আমাদের মত ক্ষুদ্রু প্রাণীর জন্য তারা এত দামী জিনিস খরচ করবে না। মানুষ লেগেছে মানুষের পিছে। সব মানুষ খতম না করে ওদের শান্তি নেই। সব চেয়ে বুদ্ধিমান জাতি কিনা।

তুমিও এক পাগল, আর যে তোমাকে এই খবর দিয়েছে সেও আর এক পাগল। একি কখনও হতে পারে নাকি ? জেনে শুনে কেউ কখনও এমন কাজ করে।

করে গো করে। এই দুনিয়াটা একটা আজব চিড়িয়াখানা। অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি, শোননি এ কথা ?

আচ্ছা, তাই যেন হোল, তোমারই বা তাতে এত ফুর্তি কেন ?

বারে বা, ফুর্তি হবে না ? জান শিয়ালনী, একদিন এই পৃথিবীটা আমাদের পশুদের রাজত্ব ছিল। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছিল শুধু বন আর বন। চারপেয়ে পশুরা তার মধ্যে মনের আনন্দে ঘুরে

বেড়াত। তখন মানুষ কোথায়? মানুষতো সেদিনের ছেলে। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল। এসেই কথা নেই বার্তা নেই বন কেটে আবাদ করে গ্রাম আর শহর বন্দর বানাল। শুধু কি তাই, পশুদের ধরে বেঁধে পোষ মানিয়ে চাকরের কাজ করাতে লাগল। দেখছ না গরু, ঘোড়া, মোষ, কুকুর এমন কি হাতী যে হাতী, সেই হাতী পর্যন্ত ওদের গোলাম হয়ে খেটে মরছে।

ওমা তাই নাকি? এসব কথা তো কোন দিন শুনিনি। শুনবে আবার কি? দেখছনা চোখে? চোখ নেই? তারপর শোন, যারা কিছুতেই বশ মানতে চাইল না, ওরা তাদের মেরে কেটে শেষ করতে লাগল। ওদের কত যন্তর-মন্তর কত কি। আমরা কি ওদের সংগে পারি? দেখনা কত কষ্টে জান বাঁচিয়ে আছি। কিন্তু আমাদের মত বুনো পশুদের সংখ্যা দিন দিনই কমে আসছে। এভাবে আর ক'দিন?

শেয়ালনী মেয়ে সন্তান। এ সমস্ত কথা কোন দিনই শোনেনি। কাজেই কোন দুর্ভাবনাও তার ছিল না। আজ এক সংগে অনেক ভাবনা তার মাথার উপর চেপে বসল। সে বলল, তাই তো, তবে আমাদের উপায়? আহা, আমার বাছাদের কি গতি হবে? শিয়াল মহা উৎসাহে লাফিয়ে উঠল, ভাবছ কেন শেয়ালনী, এবার আমাদের দিন ফিরছে। সেই খবরই তো বলতে এলাম। ওদের নিজেদের যন্তরে ওরা নিজেরাই মরতে চলেছে। এবার আমাদের রাজ্য আবার আমাদের হাতে ফিরে আসবে। আসবেই আসবে। আবার বনে জংগলে সারা পৃথিবী ছেয়ে যাবে। তখন কি মজা।

হ্যাঁ গো, একি সত্যি কথা? তুমি আমায় ফাঁকি দিচ্ছ না তো?

ছি ছি, আমি তোমায় ফাঁকি দেব? আর এক কথা শোন, আমাদের বুড়োরা বলত আড়াই বছর পরেই হোক বা আড়াই শ বছর পরেই হোক বা আড়াই হাজার বছর পরেই হোক

বা আড়াই লাখ বছর পরেই হোক এই রাজ্য আবার দু পেয়েদের হাত থেকে আমাদের চার পেয়েদের হাতে ফিরে আসবে। বয়সের গরমে আগে এসব কথা গ্রাহ্যি করিনি। এখন দেখছি সেই কথাই তো ফলতে চলল। বুড়োদের কথার দাম আছে।

হঠাৎ শেয়ালনীর একটা কথা মনে পড়ে গেল, আচ্ছা, ওই যে সামনের গেরস্ত বাড়ীর ছোট ফুটফুটে খোকাটা, ওকেও কি?

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকেও মরতে হবে। ওরা কেউ বাঁচবে না, কেউ না। ঝাড়ে বংশে সব লোপ পাবে।

আহা। এত আনন্দের মধ্যেও শেয়ালনীর বুক থেকে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

বনবাসে

পিঠো পিঠি দুটি ভাই। লোকে বলে রাম আর লক্ষ্মণ। আজকালকার দিনে এমন নাকি দেখা যায় না। যেখানে যাবে দুটিতে এক সংগে যাবে, যাই করবে দুজনে এক সংগে মিলে করবে। একজনকে ছেড়ে আর একজন একদণ্ড থাকতে পারে না। যে দেখে সেই বলে, না : সেই রাম লক্ষ্মণই যেন ফিরে এসেছে।

ঘরে ঘরেই ওদের নিয়ে কথা। সবাই নিজের ছেলে মেয়েদের কাছে ওদের তুলনা দিয়ে বলে, দেখতো রাম লক্ষ্মণ, কি সুন্দর দুটি ভাই। আর তোরা এমন কেন? ওদের বাপ মার দেওয়া নামটা পিছনে পড়ে রইল। লোকের মুখে মুখে রাম লক্ষ্মণ নাম ক্রমে চালু হয়ে গেল। ওদেরও শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে। রাম লক্ষ্মণ বলে ডাকলে ওরা সাড়া দেয়।

কিন্তু গ্রামের লোক যাই মনে করুক না কেন, ওরা কিন্তু ঝগড়াও করত মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে অর্থাৎ প্রায় রোজই। খেলতে খেলতে ঝগড়া বেঁধে যেত। তুমুল ঝগড়া। আবার ঝগড়া মিটতেও বেশী সময় লাগত না। রাম লক্ষ্মণের মা বলেন, এমন দুরন্ত ছেলে নাকি ভূভারতে নেই। রাম লক্ষ্মণের ঠাকুরমা বলেন, ঘর জ্বালানী পর ভাঙানী, পিঠো পিঠি ভাই ঝগড়া ঝাটি করবে না, এমন কি কখনও হয় নাকি? রামায়ণের যে রাম লক্ষ্মণ ছোট বয়সে তাঁরাও কি ঝগড়া করেন নি? নিশ্চয়ই করেছেন। খুবই করেছেন। তবে বাল্মিকী মুনি সে সব কথা একেবারেই চাপা দিয়ে গেছেন। পরে তাঁরা খুব নামজাদা লোক হয়েছিলেন কিনা, সেইজন্য বড় লোকের সাত খুন মাপ।

এক দিন হয়েছে কি, আমাদের এই রাম লক্ষ্মণ দুটতে খুব মারামারি করল। মা ওদের দু জনকে একচোট শাসন করে শেষে ঘরের মধ্যে আটকে রাখলেন। মায়ের এতবড় অন্যায় আচরণ ওরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলে না। মারামারি করেছে তাতে হয়েছে কি! এমন মারামারি তো তারা রোজই করে। সে জন্য এমন করে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে হবে? মনের দুঃখে দুই ভাই কতরকম জল্পনা কল্পনা করল। রাম বলল, আমি আর বাড়ীতে থাকব না। আমি বনেই চলে যাব। লক্ষ্মণ বলল, দাদা, আমাকে সংগে নেবে?

নিশ্চয়, তোকে ফেলে কেমন করে যাব? লক্ষ্মণ ছাড়া রাম কখনো বনে যেতে পারে নাকি!

সেদিন সন্ধ্যের কিছু আগে ওরা ছাড়া পেল। কিন্তু ছাড়া পেলে কি হবে, ওদের সেই কথা ওরা ভোলেনি। বনে যেতেই হবে। এখানে কথায় কথায় মারধোর আর ঘরে আটকে রাখা! এত কষ্ট সয়ে এখানে থেকে লাভটা কি? সেদিন রাত্রিবেলাও পাশাপাশি শুয়ে ওরা এই নিয়ে কত কি পরামর্শ করতে লাগল। মা ধমক দিয়ে বললেন, 'এই পাজ গুলো ঘুমোনি! সারাদিনেও তোদের হয়নি, আবার এত রাত্রিতে গুজুর গুজুর। শুধু শুধু এ রকম বকুনি খেলে রাগ হয় না? রাম আস্তে আস্তে বলল আচ্ছা বকে নাও যত খুশী আজ, কাল বুঝবে মজাটা।

রাত্রি ভোর হয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠেই লক্ষ্মণ বলল, দাদা, ও দাদা, চল দেখে আসি হাঁসগুলি ডিম দিল নাকি। আজ যদি ডিম দেয়, তবে তুই অর্দ্ধেক, আমি অর্দ্ধেক। আর যদি দুটো ডিম দেয় তাহলে তো খুব মজা, এক একজন একটা করে। না রে দাদা?

রাম লক্ষ্মণের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। সে কিরে, আজ যে আমরা বনে যাচ্ছি। লক্ষ্মণ লজ্জা পেয়ে গেল, বলল, ওঃ হো,

ভুলে গিয়েছিলাম তো। তবে আমরা তো আর এখনি যাচ্ছি না? দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে তবে তো, না রে দাদা?

না না আমরা এখনি যাব। লক্ষ্মণ কিন্তু ইতিমধ্যে এক দৌড়ে হাঁসের খোঁয়াড়টা দেখে এসেছে। না একটা ডিমও দেয়নি। যাক তবু নিশ্চিন্ত মনে এবার বনে যাওয়া যাবে। ডিম থাকলে তা ফেলে চলে যেতে একটু কষ্টই হোত। লক্ষ্মণ ডিমের খুবই পক্ষপাতী।

কিন্তু হঠাৎ একটা নতুন চিন্তা রামের মাথায় এসে ধাক্কা মারল। এ পর্যন্ত কথাটা একবারও মনে হয়নি, কি আশ্চর্য। সংগে একটা সীতা না থাকলে রাবণ কাকে চুরি করবে? আর কি নিয়েই বা রাবণের সংগে যুদ্ধ হবে? লক্ষ্মণকে কথাটা খুলে বলতেই লক্ষ্মণও স্বীকার করে নিল, কথাটা ঠিকই।

কিন্তু এখন সীতা পাওয়া যাবে কোথায়? লক্ষ্মণ বলল, ও বাড়ীর পুঁটুকে বলে দেখলে কেমন হয়? বললে হয়তো রাজী হতেও পারে।

রাম বলল, ঠিক বলেছিস্, পুঁটুকেই চাই। আর কাউকে দিয়ে চলবে না।

কিন্তু পুঁটুদের বাড়ীতে গিয়ে দেখা গেল পুঁটু বাড়ীতে নেই। ওর মাকে জিগ্যেস করতে তিনি বললেন, ও হারামজাদী কি বাড়ীতে থাকে। সারাদিন কেবল পাড়ায় পাড়ায় টহ টই করে বেড়াবে। আসুক ও বাড়ীতে, ওকে আজ ছেঁচব। পুঁটুর মা'র মেজাজটা বিশেষ সুবিধার নয় আজ। ওরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

অনেক খুঁজে খুঁজে তবে ওকে পাওয়া গেল। তখন বেলা বাজে প্রায় দশটা। ওদের প্রস্তাবটা শোনা মাত্রই পুঁটু রাজী।

বলল, দাঁড়া মাকে একটু বলে আসি। রাম বাধা দিয়ে বলল, না না মাকে বলবি কিরে? তাহলে কিছুতে যেতে দেবে না। পুঁটু বলল, ঠিকই বলেছিস্। মা সবটাতেই বড় গোলমাল করে।

তারপর কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বলল, চল তবে।

রাম বলল, কোথায় ?

কেন, ওই যে বনে না কোথায় যাবি বললি ?

লক্ষ্মণের মনে সন্দেহ হোল, পুঁটু ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে পারে নি। সে বলল, আর কিন্তু আমরা ফিরে আসব না।

কোন দিন না ?

রাম বলল, না না, ফিরব। তবে ফিরতে দেরী হবে। চোদ্দ বছর পরে।

চোদ্দ বছর ক'দিনে হয় পুঁটুর সেই ধারণা ছিল না। সে বলল, সে দেখা যাবে। এখন চল্ তো। ওর যেন আর দেরী সইছিল না। কিন্তু রামের তখনও সব কথা বলা হয়নি।

সে বলল, কথা শোন আগে। তুই আর এখন থেকে পুঁটু নস, তুই হবি সীতা। আমরা রাম, লক্ষ্মণ আর তুই সীতা। এখন থেকে সীতা বলে ডাকলে সাড়া দিবি কিন্তু।

পুঁটু একটু আশ্চার্য হয়ে বলল, কেন, সীতা কেন ? উঁহু: আমি কক্ষনো সীতা নই।

লক্ষ্মণ বলল, দূর বোকা, খেলা-খেলা সীতা। "ও" এবার পুঁটু বুঝতে পারল।

আমাকে সীতা সাজতে হবে ? তা আমি খুব পারব। কিন্তু আমাকে কি কি করতে হবে ; সে কথা বলেদে আগে।

রাম বলল, বনে গিয়ে আমি আর লক্ষ্মণ ফলমূল শাকপাতা শিকার করে নিয়ে আসব। আর তুই তা রান্না করবি। পারবি না।

হ্যাঁ, খুব পারব। পুতুলের বিয়েতে আমি কত রান্না করেছি। বেশ হবে। চল্ তবে। মেয়ে যাবার জন্য নেচে উঠল।

বেলা বাজে সাড়ে দশটা। রাম আর সীতা দু জনেই বনে যাবার জন্য ছটফট করছে। কিন্তু লক্ষ্মণ একটু বেঁকে বসল। তার কথা হচ্ছে এই যে, এখন খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, খিদেও

লেগেছে খুব। বন কোথায়, কত দূরে। ঠিক আছে কিছু? পথে খাবার কোথায় মিলবে? তার চেয়ে খেয়ে দেয়ে যাওয়াই ভালো। শেষ পর্যন্ত রামকে লক্ষ্মণের কথাই মেনে নিতে হোল। লক্ষ্মণের বিবেক-বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানটা রামের চেয়ে অনেকটা বেশী। রাম একেবারেই রামাচন্দর।

খাওয়ার পর থেকেই যাওয়ার উয্যোগ-আয়োজন শুরু হয়ে গেল। লক্ষ্মণের বিবেক বুদ্ধি যে রামের চেয়ে বেশী এবারও তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সে বলল, এই দাদা, বিছনা না নিয়ে গেলে শুবি কিসে? রাম উত্তর দিল, বনবাসে যাবার সময় রাম লক্ষ্মণ কি বিছনা নিয়ে গিয়ে ছিল? লক্ষ্মণ ওর প্রতিবাদ করতে পারে না। সে জানে রামায়ণ রামের নখ দর্পণে। এ বিষয়ে সে যা বলে তা মানতেই হবে। সে আর একবার বলল, কিছু পয়সা নিয়ে নেব মার বাক্স থেকে? পথে ঘাটে কাজে লাগবে। রাম বলল, উহুঁ: চুরি করা কিছুতেই চলবে না। চুরি করা মহা পাপ।

এ অবস্থায় কি করতে পারে লক্ষ্মণ? তার গোপনে সঞ্চয় করা চারটে পয়সা ছিল। রামকে জিগ্যেস না করে গোপনেই সে পয়সা ক'টা পকেটে ফেলল। তার মনে মনে ভয় ছিল। রাম হয়তো এতেও আপত্তি তুলতে পারে। আরও কয়েকটা ভাল ভাল প্রস্তাব ছিল তার। কিন্তু রাম সবগুলোকেই বাতিল করে দিল। কাজেই উয্যোগ আয়োজন করবার মত আর কিছুই রইল না।

কিন্তু মুসকিল বাঁধল সীতাকে নিয়ে। সীতার মা দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর সীতাকে নিয়ে পড়েছেন। এতদিন ও পড়া-শোনায় যত গাফিলতি করেছে, আজ এক দিনে তিনি তা সারিয়ে তুলবেন বলে যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন। তার হাত থেকে সীতাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে তিনটা বেজে গেল। রাম ও লক্ষ্মণের সংকেত-শব্দ শুনে শুনে সীতা অস্থির হয়ে উঠছিল। কিন্তু মা যে বই-পত্র নিয়ে পথ আগলে বসে আছে। কিন্তু সারা দিন খাটুনীর পর

মা'র শরীরও ঘুমে ভেংগে আসছিল। একটু একটু করে তিনি নুয়ে পড়েছিলেন। সীতা আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। তার পর মায়ের নিশ্বাসের শব্দটা বেশ ভারী হয়েছে টের পেয়ে সে টুক করে কেটে পড়ল।

উৎসাহ ওদের কারুরই কম নয়। খাঁচার পাখী এতদিন বাদে দরজা খোলা পেয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ঘন্টাখানেক ওরা বেশ হাঁটল। মাঠের পর মাঠ গ্রামের পর গ্রাম পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। প্রথম প্রথম ভারী মজা লাগছিল। কিন্তু যতই এগোতে লাগল, পা ততই ভারী হয়ে আসতে লাগল।

ওরা তিন জনই বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করছিল। রাম সীতার দিকে চেয়ে জিগ্যেস করল, কিরে সীতা, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে? একটু জিরিয়ে নিবি? কিন্তু কষ্ট হচ্ছে, সীতা এ কথটা কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী হল না। রাম লক্ষ্মণের দিকে তাকাল। কিন্তু যে ক্ষেত্রে সীতার কষ্ট হয় না, সেখানে লক্ষ্মণের কি করে কষ্ট হতে পারে! তিন জনের মধ্যে দু জন গেল। বাকী রইল রাম। কিন্তু দলের নেতার পক্ষে এ কথাটা স্বীকার করা মানায় না। তাই তারা তিন জন চলতে লাগল।

একটা লোক কতক্ষণ ধরে তাদের পিছন পিছন আসছিল। লোকটার ভিখারীর মত চেহারা। সে এবার একটু পা চালিয়ে এসে ওদের ধরে ফেলল। তখন এদিকে ওদিকে লোক চলাচল করছে, কিন্তু ওদের তিন জনের দিকে কারু নজর পড়েনি। ভিখারীর মত লোকটা তাদের জিগ্যেস করল, "এই ছেলেরা তোমরা কোত্থেকে আসছো?"

লক্ষ্মণ এই প্রশ্নের উত্তর কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু রাম তাকে ইসারায় থামিয়ে দিয়ে বললো, অযোধ্যা থেকে।

কি?

অযোধ্যা।

লোকটা বিড়বিড় করে বলে উঠল, কি বলে ছাই বোঝাই যায় না। তারপর আবার প্রশ্ন করল, তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

রাম বলল, বনে। আমরা রাম লক্ষ্মণ সীতা তিন জন বনবাসে যাচ্ছি। তুমি জান এখান থেকে বন কত দূরে? তুমি আমাদের বনের পথ দেখিয়ে দিতে পার?

লোকটা এবার সবগুলো দাঁত বের করে হেসে ফেলল। তার পর বলল হ্যাঁ, খুব পারি।

তোমরা তো বনের কাছেই এসে পড়েছ। আমার সংগে চল, আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।

ওরা তিন জন তার পিছন পিছন চলল। কতক্ষণ পর সত্য-সত্যই বন দেখা দিল। বিরাট এক আম বাগান। বন দেখে ওরা মহা খুশী। রাম জিগ্যেস করল, এই কি দণ্ডকারণ্য?

লোকটা বলল হ্যাঁ, হ্যাঁ।

তা হলে তো গোদাবরী নদী এখানেই আছে।

আছে বই কি। আজতো আর বেশী বেলা নেই, কাল দেখতে পাবে। কিন্তু রাম লক্ষ্মণ সীতা, তোমাদের খুব খিদে পেয়েছে না?

ওরা তিন জনই এক সংগে বলে উঠল, হ্যাঁ পেয়েছে।

তবে এক কাজ কর। ঐযে সামনে উঁচু গাছটা দেখছ না, ঐ গাছটায় অনেক ফল পেকে আছে। ওর নাম অমৃত ফল। ওই ফল খেলে আর খিদেতেষ্টা থাকবে না। রাম লক্ষ্মণ যাও, তোমরা কোঁচড় ভরে ঐ ফল নিয়ে এস। সীতা এখানেই থাক। অনেক হেঁটেছ, আর হাঁটতে পারবে না।

রাম লক্ষ্মণ বলল, ঠিক ঠিক। এই বলেই তারা অমৃত ফল আনতে ছুটল। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তারা সেই গাছে একটা ফলও দেখতে পেল না। শেষে কি আর করবে, মন খারাপ করে ফিরে আসতেই হোল। কিন্তু এর ফলে খিদেটা যেন আরও দশগুণ বেড়ে গেল।

ফিরে এসে দেখে, হায় হায়, কোথায় গেল সীতা? সীতাও নেই, সেই লোকটাও নেই। দুজনেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। সর্বনাশ, মেয়েটা গেল কোথায়? রাম 'সীতা সীতা' বলে প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকতে লাগল। লক্ষ্মণ চেঁচাতে লাগল, পুঁটু ও পুঁটু, কোথায় গেলিরে? কিন্তু সীতা কিংবা পুঁটু কেউ তাদের সাড়া দিল না। ডাকতে ডাকতে গলা ভেংগে গেল। শেষে ক্লান্ত হয়ে তারা দুজনেই বসে পড়ল। দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি তাদের ছিল না। রামায়ণের আসল রাম আসল সীতাকে হারিয়ে বলে ছিলেন, "আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে,—আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে, আর আমার মর-মর অবস্থা হয়েছে।" এদেরও প্রায় সেই একই দশা।

রাম বলল, বুঝলি লক্ষ্মণ, ওই লোকটাই লংকার রাবণ। ভিক্ষুক সেজে এসে আমাদের সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। লক্ষ্মণ চমকে উঠল। এ কথাটা কিন্তু তার এক বারও মনে হয়নি। সে মনে মনে ভাবছিল, সেই লোকটা হয় চোর নয় ডাকাত। কে জানে, হয়তো বা পুঁটুকে মেরেই ফেলেছে।

রামের কথা শুনে তার মনে হোল, সত্যিই তো রাবণও তো হতে পারে। এ অবস্থায় রাবণ হওয়াই তো সম্ভব। কিন্তু রাবণ তো রামের হাতেই মারা গিয়েছিল। সেই মরে যাওয়া রাবণ কি করেই বা আবার ফিরে আসবে? তবে রাক্ষসদের মরার বিশ্বাস কি? অথবা এমনও হতে পারে, সেই রাবণ মরে আবার এক রাবণ হয়ে জন্ম নিয়েছে। তা না হলে ওসব ব্যাপারে রাম তো বাজে কথা বলবার ছেলে নয়।

হঠাৎ রামের কি যে হোল, সে 'হনুমান' 'হনুমান' করে ডাকা-ডাকি করতে লাগল।

কাকে ডাকছিস রে দাদা? লক্ষ্মণ জিজ্ঞেস করল।

আরে, দেখছিস, না, ঐ যে হনুমান এসেছে। সত্যসত্যই তো,

বিরাট এক বানর। তার পিছন পিছন আরও কয়েকটি। আশ্চর্য, এই কি সেই হনুমান?

রাম বলল, এই হনুমানের সাহায্যেই আমাদের সীতার উদ্ধার হবে।

এত ডাকাডাকিতেও হনুমান কিন্তু কাছে এগিয়ে আসতে চাইল না। কিন্তু রাম যখন ডাকতে ডাকতে তার কাছাকাছি গেল, তখন হনুমানও কাছে এল। কিন্তু এমনি এল না। থো থো করে তাড়া করে এল। ফলে রামকে পিছিয়ে আসতে হোল। কেননা রাম জানত রামায়ণের হনুমান রামের কাছে হাত জোড় করে এসেছিল, এমন বোদিবের মত আসেনি।

লক্ষ্মণ বলল, এটা হনুমান নয়রে দাদা, এ বোধ হয় বালি। রাম খুব চিন্তিত ভাবে মাথা নেড়ে বলল, তুই বোধ হয় ঠিকই বলেছিস।

ক্রমে বিকেল থেকে সন্ধ্যা, আর সন্ধ্যা থেকে রাত্রি হয়ে এল। এবার? রাম-লক্ষ্মণের জীবনে এমন দুর্যোগ আর কখনও আসেনি।

উঃ কি অন্ধকার। লক্ষ্মণ কাঁদ কাঁদ সুরে বলল, দাদারে, কি হবে?

আশ্চর্য রাম, সে তখনও বলল, ভয় পাসনে। বন তো এই রকমই হয়।

দাদার সাহস দেখে লক্ষ্মণ অবাক হয়ে গেল। অন্ধকারে একটা বড় গাছকে দৈত্যের মত দেখাচ্ছিল। লক্ষ্মণ তার দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওটা কিরে দাদা, রাক্ষস নাকি? রাম স্থির ভাবে বলল, হতেও পারে। দণ্ডকারণ্যে তো আর রাক্ষসের অভাব নেই। রামের কথায় লক্ষ্মণ আরও বেশী ঘাবড়ে গেল। ওরা যেখানে বসে ছিল, তার এপাশ দিয়ে ওপাশ দিয়ে খস্‌খস্‌ সড়-সড়্‌ করে কারা যেন চলাচল করছিল। সাপও হতে পারে। ব্যাংও হতে পারে। ইঁদুরও হতে পারে। আরও কত কিছুই তো হতে পারে।

লক্ষ্মণ চুপি চুপ বলল, হ্যাঁরে দাদা, রাক্ষস নয়তো? রাম বলল, হতেও পারে। ওরা তো সব রকম মূর্তি ধরেই আসতে পারে কিনা! লক্ষ্মণ এ কথায় আরও বেশী ঘাবড়ে গিয়ে রামকে জড়িয়ে ধরল।

রাম বলল, ভয় কিরে? আয় আমরা শুয়ে পড়ি। দু ভাই তখন গা ঘেঁষাঘেঁষি শুয়ে পড়ল। এ রকম বিছানায় আর কখনও ওরা শোয়নি। লক্ষ্মণ চোখ বুজে রামকে আঁকড়ে ধরে রইল।

রাম বলল, বুঝলি লক্ষ্মণ, আমাদের তীর ধনুক সংগে করে নিয়ে আসা উচিত ছিল। মস্ত বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। তীর ধনুক ছাড়া কি আর রাক্ষসের সংগে যুদ্ধ করা যায়! লক্ষ্মণ এ কথায় কোন উত্তর দিল না। তাদের সেই মচ্‌কা তীর ধনুকের উপর তার বেশী ভরসা ছিল না।

ওদের ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল। কিন্তু ভয় আর উদ্বেগ যতই বাড়তে লাগল, ক্ষিদেটাও যেন তার চাপে চাপা পড়ে গেল।

সব কিছুই শেষ পর্যন্ত কেটে যায়। তাদের সেই ভয়ে ভরা রাত্রিটাও কেটে গেল। সকাল বেলা ঘুম ভেংগে জেগে উঠে তারা অবাক। এ কোথায় এসেছে তারা? কিন্তু পরক্ষণেই সব কথা মনে পড়ল। সংগে সংগে পেটের মধ্যে ক্ষুধার আগুন হুহু করে জ্বলে উঠল। আর মনে পড়ল সীতার কথা।

ঘণ্টা খানেক বাদে দু জন রাখাল এই আম বাগানে গরু চরাতে এসেছিল। তারা তো এদের দেখে অবাক। এ যেন গল্পের রাজপুত্র।

তারা জিগ্যেস করল, তোমাদের বাড়ী কোথায়? রাম বলল, অযোধ্যা। কিন্তু লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি সংশোধন করে দিয়ে বলল, আমাদের বাড়ী লক্ষ্মীপুর গ্রামে।

লক্ষ্মীপুর? সে তো অনেক দূর। তোমরা এখানে কি করে এলে গো? ওরা ভাল মন্দ কিছু বলল না। ওদের ডাকা ডাকিতে আরও দু জন লোক এল। তারা বলল, ছেলে দুটো নিশ্চয়ই রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। তারপর ওদের বলল,

চল, তোমাদের বাড়ীতে রেখে আসি। রাম কিছুতেই যেতে চায় না। বোধ হয় সীতার কথা মনে করেই বাড়ী ফিরতে সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু ওরা কিছুতেই ছাড়ল না।

একজন লোক ওদের বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। রাম লক্ষ্মণের মা তো কেঁদে কেটে অস্থির। রাম লক্ষ্মণ ফিরে আসতে তাঁর দেহে যেন প্রাণ ফিরে এল। কিন্তু প্রাণ খুলে একটু হাসবার সুযোগ তাঁর মিলল না। ওদিকে পুঁটুদের বাড়ীতে কান্নাকাটি চলছে।

রাম লক্ষ্মণ ফিরে এসেছে শুনে পুঁটুর মা ছুটতে ছুটতে এলেন। কিন্তু রামের মুখ থেকে যে খবর পাওয়া গেল, তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। সে শুধু একটা কথাই বলেছে। রাবণ ওকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।

এর মানে বুঝবে কার সাধ্যি! তবু লক্ষ্মণকে জেরা করার ফলে ব্যাপারটা মোটামুটি বোঝা গেল। মেয়েটার দুহাতে দুটো সোনার চুড়ী, আর গলায় একটা সোনার হার ছিল। গুণ্ডা বদমাইসের কাজই হবে। কিন্তু এ মেয়েকে কি আর জ্যান্ত ফিরে পাওয়া যাবে?

শুধু পুঁটুর বাপ মা নয়, সমস্ত লক্ষ্মীপুর গ্রামের লোকজন ভেবে অস্থির। দিনে দুপুরেই যদি এরকম কাণ্ড ঘটে, তবে আর ছেলে পিলে নিয়ে বাস করা চলবে না। আজ কালকার ছেলে পিলে-গুলিও বা কি দস্যি। অসম্ভব, এদের নিয়ে আর পারা যায় না। সমস্ত গ্রামে রাম লক্ষ্মণের ভাল ছেলে বলে প্রচুর সুনাম ছিল। তাদের কি না এই কাজ! কেউ কেউ বলল, একদম মিটমিটে শয়তান। কিছু বুঝবার উপায় নেই।

কাল ওরা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পরই থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। লোকজন বেরিয়ে গেছে গ্রামে গ্রামে খোঁজ করতে। লক্ষ্মীপুরের বাজার বড় বাজার। অনেক দূর দূর থেকে লোক এখানে আসে বাজার করতে। পুঁটুর জন্য এই বাজারে ঢোল

দেওয়া হোল। আশে পাশের গাঁ গুলিতে শুধু এই নিয়েই বলা বলি।

অবশেষে বিকেল বেলা পুঁটুকে পাওয়া গেল। তিন মাইল দূরের আলম ডাংগা গ্রামের এক চাষী তাকে জমা দিয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় পুঁটু নাকি সেই গ্রামে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। লোকটি তাকে বাড়ীতে নিয়ে রাখল। আদর যত্ন করে খাওয়াল।

কিন্তু অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও তারা ওর পাত্তা খুঁজে বের করতে পারল না। গ্রামের নাম বলতে পারে না। কেবল বলে, আমাদের বাড়ী খুব মস্ত বড় বাড়ী, পাঁচটা বড় বড় ঘর আছে। আর বলে, আমার মা খুব সুন্দর। কিন্তু এ দিয়ে তো আর বাড়ী ঘর খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষে বাজারের ঢোলের খবর পেয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছে।

লোকটি প্রচুর খেয়ে দেয়ে পেটপুরে বিদায় হোল। যাওয়ার সময় বলে গেল, মা-ঠান মেয়েকে সাবধানে রেখ, এমন করে ছেড়ে দিও না।

পুঁটুর মার চোখে মুখে হাসি আর কান্না। শুধু পুঁটু বা রাম লক্ষ্মণের বাপ মা নয়, সারা লক্ষ্মীপুর গ্রামটাই হেসে উঠল। পুঁটু ফিরে এসেছে কিন্তু ওর হাতের চুড়ী আর গলার হার ফিরে আসেনি। ওগুলি রাবণ রাজা গাঁপ করে নিয়েছে। সকলের প্রশ্নের উত্তরে পুঁটু বলল, আমি কত করে বললাম, ওগো, তুমি এগুলি নিও না, নিও না, মা আমাকে বকবে। কিন্তু লোকটা কোন কথাই শুনল না। দেখনা আমার দুটো হাতই ছড়ে গেছে। এখনও ব্যথা করছে।

আর রামলক্ষ্মণ? তাদের কথা আর বলবেন না। তারা একদম মনমরা হয়ে পড়েছে।

তোরা সবাই সুখে থাক

এক বাঘ। বাঘ কি বাঘ, প্রকাণ্ড বড় বাঘ। এত বড় বাঘ কেউ কোনদিন দেখেনি। তার চোখ দুটো ও বাবা! তার দাঁতগুলি ভয়ে মা! দেখলে পরে জন্তু জানোয়ার ভয়ে আর কেউ নড়তে চড়তে পারে না। আর তখন বাঘ তাদের ঘাড় ভেংগে খায়।

বনের যত প্রাণী সবাই তার ভয়ে থর থর করে কাঁপে। কোন সংসারে সুখ নেই। বাচ্চা হরিণের মা'টা ডোবার ধারে জল খেতে গিয়েছিল। খুব তেষ্টা পেয়েছিল কিনা, চারদিকে তাকাবার মত আর ফুরসুত ছিল না। গলাটাকে লম্বা করে দিয়ে চক চক করে জল খাচ্ছিল। ঘুটঘুটি অন্ধকার রাত্রি, আড়ালে আড়ালে কত কিছু থাকে, সব কিছু তো দেখা যায়না, সে কি আর ভাবতে পেরেছে, এত কাছে ডোবাটার ও পারে বাঘটা চোরের মত ঝোপের আড়ালে বসে আছে? বাঘের চোখ জ্বলছে মশালের মত। সে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে। মনের আনন্দে সে মনে মনে গান ধরল।

এক দুই তিন
এসেছে হরিণ,
চার পাঁচ ছয়
আর দেরী নয়।

সত্যিই আর দেরী করল না। আস্তে আস্তে হামা দিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে সাড়া নেই, শব্দ নেই, এক লাফ। ঝড়তো পড়, একেবারে হরিণটার পিঠের উপরে। আর কি পালাবার যো আছে!

হরিণটা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। ওর মনে পড়ল ওর ছোট্ট কচি বাচ্চাটার কথা। আর মনে পড়ল সেই সবুজ বনের বুকে মখমলের মত ঘাসে বিছানো সুন্দর বাড়ীটি। কিন্তু সে আর বেশী ভাববার

সময় পেল না। বাঘটা তাকে টানতে টানতে ঝোপের ভিতর নিয়ে গেল।

বাচ্চাটাও মা'র পিছন পিছন এসেছিল। মাকে ছাড়া ও কখনো একা থাকে না। মাত্র দু-তিন মাস হল এই পৃথিবীতে এসেছে। এখানকার অনেক কিছুই ও এখনও জানে না, বোঝে না। মায়ের কাছে দুষ্টু বাঘের গল্প শুনেছে অনেক দিন। মাঝে মাঝে সেই দুষ্টু বাঘের বিকট হাঁক-ডাক শুনে ভয় পেয়ে মায়ের বুকের তলায় গিয়ে লুকিয়েছে। কিন্তু এমন যে হতে পারে তা ও কখনও ভাবতে পারেনি।

মাকে ছাড়া আর কখনও তো সে থাকেনি। এখন কেমন করে থাকবে? কোথায় থাকবে? সে খেতেও চায় না শুতেও চায় না, সারা দিন কেবল মা-মা করে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

পশু পাখী যে তাকে দেখে সেই তার দুঃখে কাঁদে। কিন্তু শুধু তো হরিণ নয়, সমস্ত বন জুড়ে ঘরে ঘরে এই একই খবর। এই দুষ্টু বাঘের পেটে কারু বাবা গেছে, কারু মা গেছে, কারু বা ভাই বোনরা গেছে। তাই সব ঘরেই কান্নাকাটি। কিন্তু কিছু করবার যো নেই। বাঘের সংগে কে পারে বল? অত জোর কার আছে? হরিণের বাচ্চা কাঁদে, কাঁদে, আর এই সমস্ত কথাই ভাবে। আর ওর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সে এমনি করে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। সেদিন রাত কাটল এক বট গাছের তলায়। বুড়ো অথর্ব বট গাছ। কত যে তার বয়স হয়েছে, কেউ সে কথা বলতে পারে না। সেই গাছের উপর থাকে ছোট এক পাখী। ভোর হতে না হতেই সে শুরু করে দিল কিচির মিচির কিচির মিচির। কত যে তার কথা। এত বলেও শেষ করতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ হরিণের বাচ্চাটার দিকে চোখ পড়তেই তার কথা বন্ধ হয়ে গেল। আহা, এমন সুন্দর বাচ্চাটা। কি হয়েছে ওর? এমন করে কাঁদছে কেন?

সে ডেকে বলল, ও ভাই শোন, শোন :

সবুজ বনের ঘুম ভাংগালো পাখীর কল কল
সোনার আলো হাত বুলালো, আকাশে ঝলমল।
আজকে শুধু হাসির মেলা, দুঃখ কিছুই নাই
হরিণ ছানা হরিণ ছানা, কাঁদছ কেন ভাই ?

হরিণ ছানা চমকে উঠে বলল, কে গো, কে তুমি আমায় ডাকছো ?

ছোট পাখী বলল,

বনের পরী ঝুমুর ঝুমুর নাচছে যে পায় পায়
ফুলের কলি ঘোমটা খুলি নয়ন মেলে চায়।
ঝির ঝিরিয়ে বইছে হাওয়া মন করে চঞ্চল
এমন দিনে কেমন করে ফেলছ চোখের জল ?

ও ভাই হরিণ ছানা, আমি তোমার বন্ধু ছোট্ট পাখী।

হরিণ ছানা বলল, এ সংসারে আমার বন্ধু কি কেউ আছে ? যদি বন্ধু হও, তবে আমার দুঃখের কথা শোনো।

ছোট পাখী বলল, বল তুমি। আমি তো সেই কথাই শুনতে চাইছি।

হরিণ ছানা তখন তার সব কথা খুলে বলল। আর বলল, তুমি আমায় কাঁদতে মানা করছ, কিন্তু আমার এ কান্না তো থামবে না। তবে আমি যেদিন ওকে মারতে পারব শুধু সেই দিনই আমি হাসব। সব কথা শুনে ছোট পাখী বলল, ওমা তুমি কেমন করে ওকে মারবে ? ও যে কত বড় বাঘ, কেউ ওর সংগে পারবে না। সবাই ওকে ভয় করে।

হরিণ ছানা লাফিয়ে উঠল, আজই ওর সংগে যুদ্ধ করব। ও আমার মাকে মারল কেন ? কেন, কেন, কেন ? ছোট পাখী বলল, না না, এ তুমি কি বলছ ? এ হয় না। তার চেয়ে এসো আমরা দুজনে মিলে বুদ্ধি করে দেখি কি করা যায়।

ওরা অনেক বুদ্ধি পরামর্শ করল, কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারল না।

ছোট পাখী বলল, আমার ছোট মাথা কিনা তাইতো বেশ বুদ্ধি ধরেনা। দেখি আমার দাদুকে একবার বলে দেখি।

হরিণ ছানা জিজ্ঞেস করল তোমার দাদু কে ?

ছোট পাখী তার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ডাকতে লাগল।

দাদু গো দাদু চোখ খোল
দেখছনা ঔ ভোর হোল।

এমন টুক টুকে ভোর বেলায় কি ঝিমুতে আছে, ছিঃ সারাদুপুর পড়ে রয়েছে যত খুশী ঝিমিও। এখন আমার কথা শোন।

বুড়ো বটগাছ হেসে বলল, বারে বা আমি বুঝি ঝিমুচ্ছি। কে বলল তোকে ? আমি তোদের সব কথাই শুনছি। ছোট পাখী বলল, শুনেছ ? বেশ গো বেশ। এবার তবে বাঘটাকে মারবার বুদ্ধি যোগাও। বাঘটাকে না মারতে পারলে বন্ধু আমার হাসবে না। বন্ধু যদি না হাসে আমিও গান গাইতে পারব না। আর আমি যদি গান না গাই, রাত আর ভোর হবে না। সূর্য আর উঠবেনা।

বট গাছ বলল, তবে তো বাঘটাকে মারতেই হবে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আছে। কিন্তু তুই কি বাঘটাকে কোন মতে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার তলায় নিয়ে আসতে পারবি ? তা যদি পারিস তবে তার পরে যা করবার আমিই করব।

ছোট পাখী একটু ভেবে নিয়ে শেষে বলল, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সে আমি পারব। ঠিক এইটুকু ওইটুকুন বুদ্ধিই আমার আছে, তার বেশী আর নেই।

গাছ বলল, তবে তোরা দুজনে মিলে খেলা কর গিয়ে। আমি সব যোগাড় যন্ত্রর করছি।

পাখী ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে হরিণ ছানার পিঠের উপর বসলো।

পাখী চলে যেতেই বটগাছ ডাকল, কুটু কুটু, কুট, কুট, কুট, কুট।

আয়রে আমার কুটকুটে
লেজ তুলে আয়, আয় ছুটে।

গাছের কোটরে থাকে কুটকুটে ইঁদুর। ডাক শুনেই সে তড়তড় করে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। এসেই বলে, কি দাদু ভাই, ডাকছ কেন?

এই সকাল বেলা
ডাকছ কেন মেলা?

তোমার পাতায় পাতায় নেচে নেচে করব নাকি খেলা? ও দাদু ভাই তোমার খেলতে সাধ হয়েছে?

গাছ বলল, হ্যাঁ রে আজ একটা নতুন রকম খেলা। হ্যাঁরে কুটকুটে, তুই আমার এই মোটা ডালটা কেটে ফেলতে পারিস?

কুট, কুটে, বলল, খুব পারি। আমার দাঁতের ধার তুমি জান না?

গাছ বলল, তাকি আর জানি নারে, তাই তো তোকে ডেকেছি। ডালটা কেটে ফেলতে ক'দিন লাগবে?

কুট, কুটে ভেবে বলল, তিন দিন।

তবে শুরু করে দে, আর দেরী করিসনে, বটগাছ ডেকে বলল।

উহুঁ: কুটকুটে কিছুতেই রাজী হতে চায় না। বলে, না এমন খেলা আমি খেলতে পারব না। এ কি আবার একটা খেলা নাকি? বলে, তোমার একটা ডাল ঝড়ে ভাংগল, একটা ডাল শুকিয়ে মরে গেল, আর একটা ডাল মোটে বাকী আছে। ও গেলে আর তোমার থাকবে কি! এ আমি পারব না।

কি আর করা, সব কথা খুলে বলতেই হোল। ডালটা কাটতে না পারলে বাঘটাকে মারা যাবে না। বাঘটা না মরলে ছোট পাখীর বন্ধু হরিণছানা হাসবে না। বন্ধু না হাসলে ছোট পাখী গান গাইবে না। আর ছোট পাখী যদি গান না গায়, তা হলে ভোরও হবে না, সূর্য্যিও উঠবে না, হাওয়াও ছুটবে না, ফুলও ফুটবে না। তবে আর বেঁচে থেকে লাভ কি? না হয় ওর ডালটাই গেল।

তাতে দুঃখ নেই।

অনেক করে বলে কয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে বটগাছ কুটকুটেকে রাজী করাল। কুটকুটে তার দাদু ভাইর কথা কিছুতেই ঠেলতে পারল না।

তিন দিন বাদে ছোট পাখী বাঘের কাছে গেল। বাঘের মন খারাপ। সারারাত ঘুরে ঘুরে একটা শিকারও ধরতে পারে নি। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। একটা সুন্দরী গাছের নীচে সে লম্বা হয়ে পড়েছিল। ছোট পাখী সুন্দরী গাছের ডালে বসে মিষ্টি সুরে ডাকল, বাঘু, বাঘু!

বাঘ চমকে উঠে বলল, কে রে আমাকে বাঘু বাঘু বলে ডাকছে, এমন সাহস কার?

ছোট পাখী বলল, আমি যে তোর মা! আমি তোকে দেখতে এলাম।

বাঘ মুখ ভেংচে বলল, বাজে কথা বলিস না, আমার মা কবে মরে গেছে। আর তুই তো এইটুকুন পাখী, তুই আবার আমার মা হবি কেমন করে? পাখী কি কখনও বাঘের মা হতে পারে?

ছোট পাখী বলল, তুই তা জানিস না, কেমন করেই বা জানবি? পশুরা মরলে পরেই তো পাখী হয়ে জন্মায়। আগে ছিলাম বাঘ, এখন হয়েছি পাখী।

বাঘ রাগ করে উঠল, হ্যা, একটা কথা বললেই হোল, আগে ছিলাম বাঘ, এখন হয়েছি পাখী! আমাকে বোকা পেয়েছিস? যা যা, মা-ই হোস্ আর যাই হোস্ ভাগ্। আমার এখন ক্ষিদের জ্বালায় কথা কইতে ইচ্ছে করছে না।

ওমা ক্ষিদে পেয়েছে নাকি? ছোট পাখী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, তবে চল চল আমার সংগে। ওই যে দক্ষিণ দিকে বুড়ো বটগাছটা আছে ওর তলায় দুটো হরিণ এখুনি আসবে খেলা করতে। ওরা কথা বলছিল, আমি শুনলাম। আমি সব জায়গায় যাই, সব খবর পাই, আমি থাকতে তোর আর খাবার ভাবনা কিরে?

বাঘ ভাবল, কি জানি হতেও পারে বা। সব কথা তো সবার জানা নেই। সে তো আর মরে দেখেনি কি হয় না হয়। আচ্ছা, বটগাছের তলায় গিয়ে একবার পরখ করেই দেখা যাক না। সত্যি সত্যিই যদি হরিণ মেলে তবে বোঝা যাবে ঠিকই মা। আর এমন একটা মা যদি পাওয়া যায়, ভালই তো। ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে।

ওরা দুজনে মিলে বটগাছের কাছে এল। বাঘ এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, কই, কোথায় তোর হরিণ?

ছোট পাখী বলল, তুই একটু বোস্ বাবা। আমি একটু এগিয়ে দেখে আসি। বললে কি হবে, সে কিন্তু কোথাও গেল না, চুপ করে বট গাছের পাতার আড়ালে বসে রইল। সে মজা দেখতে বসল, দেখি দাদু ভাই এবার কি করে। বাঘ আর বসে থাকতে পারল না, একেবারে টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

এদিকে কুট্‌কুটে ইঁদুর কুট্‌কুট্ করে বটগাছের ডাল কেটে চলছে। যন্ত্রণায় বটগাছের বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু সে কোনমতে ডেকে বলল, কুট্‌কুটে, আর দেরী নয়। শীগ্‌গির কর্ শীগ্‌গির!

কুট্‌কুটে উত্তর দিল, এই যে হয়ে এল দাদু, আর একটুখানি।

ছোটপাখী কিছুই বুঝল না। সে অবাক হয়ে ভাবছিল দাদু ভাই আর কুটকুটে এ সব কি বলছে। কিন্তু তার আর বেশী ভাববার সময় ছিল না। হঠাৎ মড় মড় করে ডালটা ভেংগে পড়ল। পাখী ভয় পেয়ে ফুড়ুৎ করে আকাশে উড়ল। আর সেই মোটা ডালটা পড় তো পড় একেবারে বাঘের উপরে চেপে পড়ল। আর সেই বিষম চাপে বাঘ আর বাঘ রইল না। ভেংগে চুরে চ্যাপ্‌টা হয়ে গেল।

ছোটপাখী এবার বুঝল ব্যাপারটা। সে একা নয় সবাই টের পেয়ে গেছে। শেয়াল পণ্ডিত বাঘের গন্ধ পেয়ে ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছিল, ব্যাটা কি করে। তার নজরে কিছুই এড়ায় না।

বাঘটাকে চাপা পড়ে থেঁতলে যেতে দেখে সে মহা আনন্দে 'হুয়া হুয়া' বলে গলা ছেড়ে সবাইকে ডাকতে লাগল। তার ডাক শুনে বনের পশুরা দলে দলে আসতে লাগল। শেয়াল তখনও ডেকে চলেছে, হুয়া হুয়া! সবাই জিজ্ঞেস করল, ক্যা হুয়া?

শিয়াল সবাইকে নিয়ে মড়া বাঘটার কাছে গেল। যেই না দেখা, আর কি কথা আছে! মনের আনন্দে সমস্ত পশু নাচগান শুরু করে দিল। তারা গাইছিল, আর ভাবনা নেই, বাঘের জুলুমের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন থেকে আমরা যেমন খুশী ঘুরে বেড়াব।

সেদিন সবার মুখে হাসি। হরিণছানাও হাসছিল। তার মনে আর কোন দুঃখ নেই। শুধু ছোট পাখী তার পাখা ঝাপটে কাঁদছিল। আর কাঁদছিল কুটকুটে। তাদের জন্যই তো দাদু এখন মরতে বসল।

ছোটপাখী কেঁদে কেঁদে বলছিল, ও দাদুভাই, কেন এমন করলে? তোমার তো একটা ডালও বাকী রইল না। তুমি যে এখন মরে যাবে।

বটগাছ বলল, দুর বোকা, তোরা দুজন এমন করে কাঁদছিস কেন? এমন আনন্দের দিনে কি কাঁদতে আছে! ও ছোট পাখী, ওই দেখনা, তোমার বন্ধু হরিণছানা কেমন মনের সুখে হাসছে। শুধু সেই তো নয়, এই বনের পশু পাখী সবাই হাসছে। আজ সারা বনে কি আনন্দ! আমার সময় হয়েছে, আমি মরব, তাতে কি? কিন্তু তোরা সবাই সুখে থাক।

মামা-ভাগনের কাহিনী

বাঘ বলল হালুম।

তার মানে? তার মানে আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আমি খাব।

সেই ডাক শুনে সারা বনের পশুপাখী চমকে উঠল। ওরে বাপরে বাপ, এক একটা ডাক ছাড়ে আর সারাটা বন যেন কাঁপতে থাকে থরথর করে। পশুরা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু করে দিল – পালা, পালা, পালা।

একটা লম্বা ঘুম ঘুমিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার পরে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বসেছে বাঘ।

পেটে এখন ক্ষিদের আগুন জ্বলে উঠেছে। তাই বাঘ বলল, —হালুম। তার মানে আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আমি খাব।

ঠিক এমনি সময় শেয়ালও বেরিয়েছে খাবারের খোঁজে। পড় তো পড় একেবারে বাঘের মুখোমুখি পড়ে গেল। অবশ্য বাঘ আর শেয়াল মামা-ভাগনে। মামা কি আর ভাগনেকে খাবে? কিন্তু তবু এই ক্ষিদের সময় ওর মুখের সামনে পড়ে যাওয়াটা ভাল হয়নি, শেয়াল মনে মনে ভাবল।

যা হয়ে গেছে, হয়েই গেছে, কি আর করা যাবে। শেয়াল মিষ্টি হাসি হেসে বলল, মামা গো মামা, নমস্কার। শরীর গতিক ভাল তো? বাঘ বলল, শরীরও ভাল, গতিকও ভাল, কিন্তু মুসকিল কি জান, ক্ষিদের ঠেলায় মনটা খাই খাই আর প্রাণটা যাই যাই করছে।

শেয়াল শুনে আঁতকে উঠল, ও বাবা মনে মনে যা ভয় করেছে তাই। শেষ পর্যন্ত ওকে দিয়েই ক্ষিদে মেটাবে না তো?

বাঘও মনে মনে সেই কথাটাই ভাবছিল। কিন্তু দেশশুদ্ধ সবাই জানে শেয়াল বাঘের ভাগনে। এখন মামা হয়ে সে যদি ভাগনেকে খায় তাহলে দেশে দেশে নিন্দে রটে যাবে। তা ছাড়া শেয়ালের মাংস বড় শক্ত, রস-কস নেই, পেটে গিয়েও সেদ্ধ হতে চায় না। তা ছাড়া বড় বেশী শেয়াল-শেয়াল গন্ধ। কিন্তু তেমন খিদে লাগলে তখন আর শক্ত আর নরম! খিদের মুখে বালিও ভাল লাগে।

বাঘ বলল, কি বলব ভাগনে, খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম, —এ বনে কত রকমের কত জানোয়ার, কিন্তু এখন এক ব্যাটার সংগে দেখা নেই। কোথায় যে সব পালিয়েছে। এই তোমার সংগেই প্রথম দেখা হলো।

কথা শুনে শেয়ালের বুক ভয়ে দুরু দুরু করে উঠল। কে জানে আজ কি আছে কপালে! কিন্তু ভয় পেলেও একেবারে ঘাবড়ে গেল না। মনে মনে নানা রকম ফন্দি ফিকির আঁটতে লাগল।

শিয়াল বলল, মামা তোমারই তো দোষ। পেরথমেই অমন হালুম করে উঠলে কেন? শব্দ শুনেই সবাই পালিয়েছে। এর পর কে আর বসে থাকবে!

বাঘ বুঝতে পারল কথা ঠিকই, অমন করে হালুম করে ওঠাটা তার ঠিক হয়নি।

সে বলল, যা' হবার হয়েই গেছে। এখন তুমি তো ওদের অন্ধি-সন্ধি সবই জানো। ওরা কোথায় পালিয়েছে, আমাকে একটু দেখিয়ে দাও দেখি। আর না যদি দেখাও, তোমারই বিপদ। আমি তো আর না খেয়ে থাকতে পারব না। সত্যি করে বল্‌ছি, তোমাকে খাবার ইচ্ছে কিন্তু আমার একটুও নেই। তুমি শুধু একটাকে ধরিয়ে দাও। ব্যস্ তার পর তোমার ছুটি। আর শোন, তোমাকেও এমনিতেই খাটাব না, তোমাকেও কিছুটা ভাগ দেব।

শিয়াল মহাবিপদে পড়ে গেল। ওদের পালাবার জায়গা কোথায়, সে খবর তার জানা আছে। ইচ্ছে করলেই দু'চারটাকে ধরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যাদের সংগে সব সময় ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, তাদের কি অমন করে বাঘের মুখে তুলে দেওয়া যায়। আর একথা যদি একবার ফাঁস হয়ে যায়, তবে কি আর রক্ষা আছে। বনের সব পশু মিলে তার দফা রফা করবে। আর কেমন করেই বা একথা চাপা থাকবে? শিয়াল উপর দিকে তাকিয়ে দেখল, গাছে গাছে বানরগুলি কান খাড়া করে ওদের কথা-বার্তা শুনছে। দেখতে না দেখতে ওরা সব কথা রটিয়ে দেবে। শিয়াল ভাবতে লাগল বাঘকে এখন কি বলা যায়। বাঘ বলল, ও, আমার কথাটা তোমার পছন্দ হোল না? পালাবার মতলবে আছ বুঝি? ও সব বুদ্ধি করো না, মরবে। আমার হাতে পড়েছো যখন, ছাড়াছাড়ি নেই। লক্ষ্মী ছেলের মত আমার কথা মত কাজ কর। এতে তোমারও ভাল আমারও ভাল।

শিয়াল বলল, মামা, এ তোমার কেমন কথা? আমি এদিকে তোমার জন্য ভেবে মরছি, আর তুমি আমায় এমন কথাটা বলতে পারলে?

বাঘ বলল, ভাগনে, তুমি দুঃখ করো না। ও কথাটা বলা আমার ঠিক হয়নি। তবে ক্ষিদের জ্বালায় অনেক সময় উল্টো-পাল্টা কথা বেরিয়ে যায়। ও তো আমার দোষ নয়, ক্ষিদের দোষ। এখন বল দেখি তোমার বুদ্ধিটা কি? তুমি তো বুদ্ধির সাগর, একথা সবাই জানে।

শিয়াল উত্তর দিল, আমি শিয়াল পণ্ডিত, সব ব্যাটার খবরই রাখি। ধরিয়ে দেবো, তার আর বেশী কথা কি। শোন মামা, ওরা তোমার ভয়ে বড়-ছোট অনেকেই নদীর ধারে গিয়ে লুকিয়েছে। আমাকেও ডেকেছিল। আমি বলে দিয়েছি, যেতে হয় তোরা যা। আমার মামা আমাকে কিছু বলবে না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম,

নদী তো এখান থেকে কিছুটা দূরে। তুমি অত দূরে যেতে চাইবে?

বাঘ বলল কি আর করা যাবে। না যেয়ে তো আর ওদের পাওয়া যাবে না। চলো তবে সেখানেই। আমি আবার নদীর পথ চিনি না। তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বাঘ বড় হুঁশিয়ার। শিয়ালকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে চায় যাতে না পালাতে পারে। চলতে চলতে দুজনে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু নদীর তীর একদম খালি। চাঁদের আলোয় নদী তীরের বালিগুলি চিক্ চিক্ করছে।

একে পেটে ক্ষুধার জ্বালা, তার উপরে এতটা পথ হাঁটা। এমনিতেই বাঘের মন মেজাজ বিশেষ ভাল ছিল না। এখন এসে দেখে খাঁ খাঁ করছে নদীর তীর, কোথাও কিছু নেই।

বাঘ চোখ লাল করে বলল, বটে, আমার সংগে ফাঁকিবাজি!

শিয়াল বলল, এই তো তোমার দোষ, একটুতেই রেগে যাও। আমি কি তোমার সংগে ফাঁকিবাজি করতে পারি? চেয়ে দেখ ভাল করে নদীর মধ্যে কি?

বাঘ জিজ্ঞাসা করল, কি নদীর মধ্যে?

শিয়াল বলল, দেখতে পাচ্ছ না, তোমাকে আসতে দেখেই সব ব্যাটা নদীর মধ্যে গিয়ে নেমেছে। মাথা পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়ে শুধু নাকটা তুলে দম নিচ্ছে।

সত্য কথাই তো। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল নদীর জলে কি যেন কিলবিল করছে। বাঘ বড় একটা নদীর ধারে থাকেনি। কুমীর কাকে বলে সেটাও তার আন্দাজ নেই। সে কেমন করে বুঝবে এই নদীতে কুমীরের মেলা বসেছে। যেই না দেখা, আর কি কথা আছে, এক লাফে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুমীররা কেউ এজন্য তৈরী ছিল না। কিন্তু তৈরী হতে সময় লাগল না। দুটো পালোয়ান কুমীর বাঘের পিছনকার ঠ্যাং দুটো কামড়ে ধরল। বাঘ চিরকাল আর সবাইকে কামড়ে খেয়েছে, তাকে তো কেউ কামড়ায় নি।

এবার সে ভাল করেই বুঝতে পারল পায়ের মধ্যে দাঁত ফুটিয়ে দিলে কেমন লাগে। এ আবার কোন্ দেশী জানোয়ার?

বাঘ যন্ত্রণায় চীৎকার করে চলল আর শিয়ালকে ডেকে বলতে লাগল, ভাগনে, ভাগনে, তোমার হাতটা বাড়াও, আমি যে উঠতে পারছি না।

শিয়াল উত্তর দিল, মামা গো, কাল আছাড় খেয়ে পড়ে দুটো হাতই যে মচ্‌কে গেছে। আমি হাত বাড়াতে পারছি না।

বাঘ জলের মধ্যে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কুমীরগুলো তাকে টানতে টানতে গভীর জলে টেনে নিয়ে চলল। বাঘ এবার কেঁদেই ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, ও ভাগনে, ভাগনে গো, আমাকে রক্ষা কর। তুমি যা চাও তাই দেব।

শিয়াল উত্তর দিল, মামা গো মামা, নমস্কার। আমি যা চাই, তা তো পেয়েই গেছি। এবার আমি চললাম। খবরটার জন্য ওরা সব অপেক্ষা করে আছে যে!

টিয়া পাখীর বাচ্চা

টিয়া পাখীর বাচ্চা মার কাছে দিনরাত গল্প শোনে। ওর মা কত যে গল্প জানে! পুরানো একটা ভাংগা বাড়ীর ছোট্ট খুপড়ীতে ওদের বাসা। সেই বাড়ীতে মানুষ জন কেই নেই, ছাড়া-বাড়ীটা জংলা গাছে ছেয়ে গেছে। গোটা দুই শেয়াল নীচের ঘরে বাসা বেঁধেছে। এ ছাড়া এ বাড়ীতে একদল চামচিকে আছে, সাপ খোপ আছে, পোকামাকড় আছে, অনেক কিছুই আছে। কিন্তু ওদের সংগে টিয়া পাখীর কোনই সম্পর্ক নেই। টিয়ে তার এই বাচ্চাটাকে নিয়ে দোতলায় ঘুলঘুলিটায় বাসা বেঁধে আছে।

মা মাঝে মাঝে বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসে। সেই আধ আলো আধ অন্ধকারে ওই ছোট্ট বাসাটুকুর মধ্যে বাচ্চা কিন্তু বেশ মনের আনন্দেই আছে। মাঝে মাঝে মা যখন ওকে ফেলে বাইরে চলে যায়, তখন বড়ই একা একা লাগে। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যই বা। মা ফিরে এলেই সে আবার আনন্দে কল-কলিয়ে ওঠে।

এতদিন ছিল বেশ ভালই। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ মার মুখে নানা রকম গল্প শুনে শুনে সে বিষম উসখুস করছে। মার মুখের গল্প শুনে এইটুকু সে বুঝতে পেরেছে যে, তাদের এই খুপড়ীর বাসাটার থেকে আসল পৃথিবীটা অনেক বড়, দেখতেও খুব সুন্দর। কিন্তু সেই পৃথিবী কোথায়, কতদূরে? মার কাছে যে সব গল্প সে শুনেছে, তা যেন ঠিক মত বিশ্বাস করতে পারছে না-কিন্তু বিশ্বাস না করেই বা করে কি? মা কি আর মিথ্যে কথা বলছে!

মা বলে, তাদের এই বাসাটা থেকে বাইরে বেরোলেই নাকি

পৃথিবীর সংগে দেখা হয়। সে কি একখানা পৃথিবী, তার আদিও নেই অন্তও নেই। আর কত রকম রকমের চেহারা তার। এক এক জায়গা এক এক রকম। পাহাড় আছে বন আছে, শহর আছে, গ্রাম আছে, নদী আছে, সমুদ্দুর আছে, আরও কত কি যে আছে, সে কথা কি কেউ বলতে পারে। আর সবার মাথার উপর নীল আকাশের একটা মস্ত বড় চাকনী। ও সব কথা শুনে বাচ্চার মন ছটফট করতে থাকে। কবে সে বড় হবে, কবে সে শিখবে, আর কবেই বা সে নিজের চোখে এ দেখবে। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, সে কি সত্য সত্যই কোনদিন মায়ের মত এত বড় হয়ে উঠতে পারবে? মায়ের মত বড় হয়ে ওঠা, সে তো আর সহজ কথা নয়।

কিন্তু সত্য সত্যই সে এক সময় বড় হয়ে উঠল। মায়ের মত অত বড় না হোক, যতই দিন যাচ্ছে, ততই সে বড় হয়ে উঠছে। এই ভাবে যদি সে ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলতে থাকে, তবে মাকে ছাড়িয়ে উঠতেই বা কতদিন? মা তখন তার কাছে বাচ্চার মতই হয়ে যাবে।

কিন্তু এখনও তার দেরী আছে। আপতত সে তার মার কাছে ওড়া শিখতে লাগল। প্রথম প্রথম ক'দিন কি যে নাকাল হতে হয়েছে। মা ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়েছে, যা যা ঝাঁপিয়ে পড়। ওরে মারে মা, কেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়বে? কত নীচে মাটি, পড়লে পরে একদম হাড় ভেংগে যাবে। ভয়ে ওর বুক দুপ্ দুপ্ করতে থাকে। ও নড়তে চায় না। কিন্তু নড়তে না চাইলে কি হবে, মা ওকে ঠেলে ফেলে দেয়, বলে, যা ভীতু কোথাকার।

বাচ্চা পড়তে পড়তে আপনাকে বাঁচাবার জন্য পাখা মেলে দিল। একটু সময় সে বাতাসের উপর ভর করতে পারল, কিন্তু সে একটুর জন্যই। তার পরেই কি যে হয়ে গেল, সে আর কিছুতেই সামলাতে পারল না, ঝটপট করতে করতে মাটির উপর আছড়ে

পড়ল। আর এমনি কপাল, ঠিক সেই জায়গাটাতেই একদল চড়ুই পাখী কি নিয়ে খুব কথা কাটাকাটি করছিল।

বাচ্চা আছাড় খেয়ে পড়তেই ওদের ঝগড়া ঝাটি থেমে গেল। ওরা টিটকারী দিয়ে হেসে উঠল, ছ্যাঃ ছ্যাঃ, টিয়া পাখীর ছানাগুলো একদম বাঙাল, কোন কম্মের না। দেখ না, লম্বায় চওড়ায় আমাদের ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু উড়তে গিয়ে কেমন তিন পাক খেয়ে ঘুরে পড়ল।

ওদের এই হাসাহাসি আর খোঁচামারা কথা শুনে বাচ্চা বড় লজ্জায় পড়ে গেল। কিন্তু একদিন, দুদিন, তিনদিন, টিয়ার ছানা দিব্যি উড়তে শিখে গেল। আর তাকে পায় কে, বাসায় মোটে ফিরতেই চায় না। মা ডেকে ডেকে হয়রান। কিসের খাওয়া, কিসের দাওয়া, সব ভুলে গিয়ে সময় নেই অসময় নেই, কেবলই ওড়ে কেবলই ওড়ে। উড়তে উড়তে কত দূরে যে চলে যায়, কত উপরে যে উঠে যায়। কি মজা লাগে তখন। মা ভেবে ভেবে অস্থির। ডেকে বলে, ওরে আর যাস্‌নে, ফিরে আয়। বাজ পাখীতে দেখলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

শেষে উড়তে উড়তে ওর ডানা দুটো যখন ভারী হয়ে যায়, তখন সে ফিরে আসে বাসায়। আর ফিরে এসে মার কাছে বকুনি খায়। এমনি ভাবে দিন যায়।

মা ওকে নিয়ে বড় বিপদেই পড়ে গেল। নতুন ওড়া শেখা অবধি, একটু সময় বাসায় বসে থাকতে চায় না। পথে ঘাটে কত যে বিপদ আছে সে খবর তো আর ওর জানা নেই। মা ওকে কত করে বোঝায়, কত করে ভয় দেখায়, ও চুপ করে বসে থাকে, কথাটি বলে না। আর যখন ফাঁক পায়, দেখ্‌ না দেখ টুক্‌ করে বেরিয়ে পড়ে।

টিয়া পাখী তো আর জানতো না যে ওকে আর ধরে রাখা যাবে না। ও দিন দিনই তার হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

মায়ের কাছে তার বাচ্চা যত ছোটই থাক না কেন, আসলে সে যে বড় হয়ে উঠছে। একদিন সে এসে ওকে চমকে দিল। বলল, মা, আমি এবার পৃথিবীটা ঘুরে দেখতে চললাম।

মা বলল সে কিরে, তুই এইটুকুন মেয়ে, তুই কোথায় যাবি? আগে বড় হয়ে নে, তারপর যেখানে খুশী যাস।

ও বলল, আমি কি এখনও ছোটই আছি নাকি? দেখছনা কত বড় হয়ে উঠেছি। তুমি কিছু ভেবো না মা, আমি পৃথিবীর এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সব কিছু দেখে শুনে তারপর আবার তোমার কাছে ফিরে আসব।

পাগলের কথা শোন। কত বড় এই পৃথিবী! তার কি কোন শেষ আছে! পৃথিবীর এদিক ওদিক, সে কি কেউ যেতে পারে?

কেউ না পারে, না পারুক, আমি পারব। বলেই বাচ্চা ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল, মায়ের কোন কথা শুনল না।

পাখী উড়ে চলল। কত দেশ দেশান্তর পেরিয়ে চলল, কিন্তু এই পৃথিবীর তো শেষ হয় না। গ্রামের পর গ্রাম, তারপর নদী, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, আবার গ্রাম, আবার বন, এমনি করে চলছেই, পৃথিবীর শেষ আর খুঁজে পাওয়া গেল না। মা তার সত্যি কথাই বলেছিল। এই ভাবে দিনের পর দিন চলতে চলতে এক বনের কাছে এসে সে একদিন বলল, না আমি আর যাব না। পৃথিবী আর শেষ হবে না। অনেকদিন উড়ে উড়ে আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি। বন পাতার ছাওয়া এই সবুজ গাছটার ডালে বসে আমি বিশ্রাম করব।

গাছটা তার কথা শুনে ডেকে বলল, এসো এসো, আমি কত পাকা পাকা ফল মাথিয়ে নিয়ে বসে আছি, তুমি যত ইচ্ছা খাও। সত্যিই তো পাতার ফাঁকে ফাঁকে থোকায় থোকায় ফল পেকে আছে। ও তখন মনে মনে ভাবল এ গাছটাই তো বড় ভাল দিয়ে গেছেন। ফল খেতে খেতে হঠাৎ সে চমকে উঠে দেখল, ডালটা যত বাড়

একটা টিয়ে পাখী আরেকটা ডালে বসে ফল খাচ্ছে।

সে এক সুন্দর পাখী। এমন সুন্দর পাখী সে আর কোন দিন দেখে নি। সেই পাখীটা তাকে দেখে বলে উঠল, বেশ হয়েছে তুমি এসেছো। আমি একটি সাথী খুঁজছিলাম। তুমি আমার সংগে খেলবে?

ও বলল, কেন খেলব না? তোমাকে দেখেই আমার তোমার সংগে খেলতে ইচ্ছা করছে। কি সুন্দর তুমি! তোমার সংগে খেলতে পেলে আমি আর কিছু চাই না। পরম সুন্দর পাখীটা বলল, তুমি তো আমার চেয়েও বেশী সুন্দর। জিগ্যেস করে দেখ এই গাছকে।

সেই থেকে ওরা সেইখানেই থাকে, দিন রাত দুইজন খেলা করে আর মনের আনন্দে গলা মিলিয়ে গান করে। কিন্তু সে যে পৃথিবী দেখতে বেরিয়েছিল? থাক, পৃথিবী দেখে আর কি হবে? পৃথিবীটা সুন্দর সত্যি কথা। কিন্তু তা যেন বড় বেশী বড়। তার চেয়ে এই গাছটা অনেক ভাল। ঠিক তাদের দুজনের মত। একদিন সে বলল, আমার একটা বাসা বাঁধতে ইচ্ছে করছে। পরম সুন্দর পাখী বলল, বেশ তো এসো আমরা দুইজনে মিলে একটা বাসা বেঁধে তুলি। সেও তো এক মজার খেলা।

ওরা দুজ'ন মিলে বাসা বেঁধে তুলল। কি সুন্দর একটি বাসা। গাছটা খুবই সুন্দর, কিন্তু তাও যেন বড় বেশী বড়। এই বাসাটা ঠিক ওদের দু'জনকার মত। ওরা সেই বাসাতেই খেলা করে, বাসাতেই ঘুমায়। এই ভাবে দিন যায়।

একদিন সে একটা ডিম পাড়ল। তার খেলা শেষ হয়ে গেছে। সে এখন রাতদিন ডিমের উপর বসে বসে তা দেয়। তার নড়বার ফুরসুৎটুকু পর্যন্ত নেই। ওর সাথী বাইরে থেকে কত কি খাবার নিয়ে আসে। তাই নিয়ে দু'জন ভাগ করে খায়।

এইভাবে ক'দিন কাটল। অবশেষে একদিন ডিম ভেংগে বাচ্চা বেরিয়ে এল। ওমা কি সুন্দর এক বাচ্চা। পাখী এখন সারা সময় বাচ্চাকে নিয়েই কাটায়, অন্য কোন দিকে তাকাবার মত সময় তার নেই। তার সাথী ডাকা-ডাকি করেও আর তার সাড়া পায় না। পাখী মনে মনে ভাবে এই সংসারে কত পাখী তো আছে, কিন্তু এমন সুন্দর বাচ্চা কেউ কোন দিন দেখেছে? হঠাৎ একদিন তার নজরে পড়ল, তার সাথী নেই তো, সে তাকে ফেলে চলে গেছে, মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মন খারাপ করবার সময় নেই। বাচ্চা তার সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে। চল্লিশ ঘণ্টা তার পিছনেই তাকে লেগে থাকতে হয়।

বাচ্চা আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে উড়তে শিখল। দিব্যি সুন্দর এদিকে ওদিকে উড়ে যায়। পাখী ওকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলে, কাছে কাছেই থাকিস, বেশী দূরে যাসনে। বাচ্চাটা হেসে বলে, হ্যাঃ তোমার যেমন কথা, কাছে কাছেই থাকবে। দূরে না গেলে আর মজাটা কি? কে জানে কেন, একথা শুনে পাখীর বুকটা ভয়ে দুরদুর করে ওঠে। একদিন বাচ্চা এসে বলল, মা আমায় বিদায় দাও।

বিদায়! বিদায় আবার কিরে? পাখী কিছুতেই বুঝতে পারল না।

বাচ্চা বলল, হ্যাঁ আমি সারা পৃথিবীটা ঘুরে দেখে আসব। আর দেখে আসব এই পৃথিবী কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

দূর বোকা, এই পৃথিবীর কি কোন শেষ আছে? কেন ঘুরে ঘুরে কষ্ট করবি? এই পৃথিবীর শেষ কোনদিন কেউ পায়নি।

কিন্তু বাচ্চা মায়ের মানা মানল না। উড়ে চলে গেল।

পাখী বাচ্চার কথা মনে করে পাখা ঝাপটে মরতে লাগল। ওকি আর কোন দিন ফিরে আসবে? ঠিক সেই সময়ই ওর মনে পড়ে গেল, সেও তো একদিন ওই বাচ্চার মত বয়সে পৃথিবী

দেখতে বেরিয়েছিল। আর আসবার সময় মাকে বলে এসেছিল, আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসব। এতদিন কেমন করে সে সব কথা ভুলে ছিল? আজ ওর মনে পড়েছে ওর মাকে আর ওদের সেই বাসাটাকে। ও আজ ওর বাচ্চাকে হারিয়ে যেমন করে কেঁদে মরছে, ওর মাও তো সে দিন তেমনি করেই কেঁদেছিল। মা পিছন থেকে কত করে ডেকেছিল, ওরে আয়, ওরে ফিরে আয়। কিন্তু সে তার সেই ডাক শুনেও শোনেনি। কে জানে ওর মা হয়তো এখনও তেমনি করে ওর পথের দিকে তাকিয়ে আছে। সব মাকেই কি এমন করে কাঁদতে হয়?

পাখী একবার ভাবল, যাই, মার কাছেই ফিরে যাই। কিন্তু কেমন করে ফিরে যাবে সে? সেই কত গ্রাম আর নগর আর পাহাড় আর নদী আর সমুদ্দুর পেরিয়ে তাদের সেই পুরানো বাসা, সে পথ কি আর তার মনে আছে?

ভালুকের মা

এক বন। সেই বনের ধারে ঘর বেঁধে কাঠুরে আর তার বউ বাস করে। ওদের ছেলেপুলে নেই। দুইজনকে নিয়েই সংসার।

কাঠুরে রোজ সকালে বনে গিয়ে কাঠ কাটে। তারপর কাঠের আঁটি বেঁধে নিয়ে বাজারে যায় বিক্রী করতে। বিক্রী করে যা পায়, তাই দিয়ে চাল ডাল তেল নুন আর যা যা লাগে সব কিনে নিয়ে আসে। এই ভাবে সুখে দুঃখে দিন যায়।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে বেশ শীত পড়ে গেছে। কাঠুরের পিঠে খাবার কথা মনে পড়ে গেল। বউকে ডেকে বলল, বউ, বউ, অনেক দিন পিঠে খাই না। আজ পিঠে বানাও। বউ বলল, ভাল কথাই বলেছ। পিঠে খাবার এই তো সময়। কিন্তু পিঠে যে বানাব, ঘরে যে কিছুই নেই। পিঠে বানাবার সাজ-সরঞ্জাম চাই তো।

ও এই কথা। তার জন্য কি? আমি সব যোগাড়যন্তর করে আনছি। তুমি সন্ধ্যাবেলায় পিঠে বানাবে। রাত্রি বেলা খাব, আবার কাল সকালেও বাসি পিঠে খাব।

কাঠুরের বউ হেসে বলল, বেশ তো। দেখব তুমি কত খেতে পার।

কাঠুরে বাজার থেকে সব কিছুই কিনে নিয়ে এসে বলল, নাও এই ধরো। আমি একটু বাইরে বেরোচ্ছি। সন্ধ্যার একটু বাদেই ফিরে আসব। কাঠুরে বউ ডেকে বলল, ফিরতে দেরী করো না কিন্তু।

কাঠুরে উত্তর দিল, ওরে বাপরে বাপ, আজ কি আর দেরী করতে পারি?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকার নেমে এসেছে। কাঠুরে বউ ভেজে ভেজে পিঠে নামাচ্ছে। এমন সময় পায়ের শব্দ শুনে কাঠুরে বউ বুঝল, কাঠুরে এসেছে।

—কাঠুরে বউ কি করছো?

কাঠুরে বউ মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল, আহা কি করছি জাননা তুমি? আমার পিঠে ভাজা প্রায় শেষ হয়ে গেল। এসেছো ভালই হয়েছে। তুমি একটা পিঁড়ি পেতে নিয়ে বসে পড়। গরম গরম ভাল লাগবে।

যে এসেছিল, সে পিঁড়ি পেতে বসে পড়ল। এমন সময় কাঠুরে বউ মুখ ফেরালো। মুখ ফিরিয়ে যা দেখল তাতে সে ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। ওরে বাবা, এক বিরাট ভালুক পিঁড়ি পেতে বসে পিঠে নেবার জন্য থাবড়া হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভালুক তার মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরে দাঁত বের করে হসে বলল, তুমি আমায় দেখে অত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তোমায় কিছু বলব না। কিন্তু তুমি আমায় পিঠে খেতে বসতে বলেছ। এখন দাও।

কাঠুরে বউ কি আর করবে, কাঁপতে কাঁপতে এক গোছা পিঠে ওর হাতের ওপর ছেড়ে দিল। না দিয়ে উপায় আছে? তা হলে সব কিছুই কেড়ে কুড়ে খাবে। আর তাকেই কি জ্যান্ত রাখবে? যে একখানা হাত, একটা চড় মারলে কাঠুরে বউকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভালুক পিঠে খেয়ে ভারী খুশী। এমন জিনিস তার জন্মে খায় নি। খালি হাতটা চেটে চুটে নিয়ে সে আবারও হাত বাড়াল। কাঠুরে বউ আরও তার হাতে ভরতি করে দিল।—এই রকম কয়েক বার চলল। খেয়ে খেয়ে ওর লোভ আর মিটতে চায় না। সে খাচ্ছিল আর মনে মনে নানা রকম মতলব

আটছিল। সে ভাবছিল, এমন অপূর্ব জিনিস একবার খেলে কি সাধ মেটে? যখন পিঠে খায়নি, সে ছিল এককথা। কিন্তু এখন তো সারা জীবন মনটা এই নিয়েই খাই-খাই করবে। তার চেয়ে কাঠুরে বউ যদি সব সময় তার সংগে থাকে, তা হলে যখন খুশী সাধ মিটিয়ে পিঠে খেতে পারবে। কিন্তু কাঠুরে বউকে ওর সংগে যেতে বললে সে কি রাজী হবে? বোধ হয় না।

আর কাঠুরে বউ মনে মনে তখন ভাবছে, খেয়ে দেয়ে এ আপদ কখন বিদায় নেবে। কাঠুরেও ফিরছে না, কি বিপদেই না সে পড়ল। কিন্তু ভালুক ইতিমধ্যেই তার মন স্থির করে ফেলেছে, সে আর দেরী করল না; টুপ করে কাঠুরে বউকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর একহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে আর একহাতে পিঠের ধামাটা নিয়ে সে সোজা তার বাড়ীর দিকে ছুট দিল।

কাঠুরে বউ ভয়ে একটা চীৎকার দিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ভালুক তাকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ীতে চলে এল। বাড়ীতে আর কেউ নেই। ভালুক একাই থাকে। মাটিতে নামিয়ে রেখে দেখল, কাঠুরে বউ চোখ বুজে শক্ত হয়ে পড়ে আছে। ডাকা-ডাকি করল, কিন্তু একটুও সাড়া দিল না। একটু নড়াচড়া পর্যন্ত করছে না। কি যে হোল কিছুই বুঝতে না পেরে ভালুক মহা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সে চিন্তিত হয়ে তার মুখে আর গায়ে হাত বুলোতে লাগল।

একটু বাদেই শীতের ঠেলায় কাঠুরে বউর জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলে চেয়ে দেখে, সর্বনাশ সেই ভালুকটা তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়েছে। তার গায়ের বুনো গন্ধে সে অস্থির হয়ে উঠল। এ কোথায় এসেছে সে! চারদিকে গাছপালা, মাঝখানে একটু ফাঁক। মাথার উপর কতগুলো তারা দেখা যাচ্ছে। কাঠুরে বউ ভয়ে আবার চীৎকার দিয়ে উঠল।

ভালুক বলল, তুমি এমন ভয় পাচ্ছ কেন? দেখ, আমার আর

কেউ নেই। ছোটবেলা একটা মা ছিল, সেও মরে গেল। তুমি আমার মা হয়ে আমার সংগে থাক। তুমি যখন যা বল আমি সব জিনিস যোগাড় করে নিয়ে আসব। আর তুমি আমাকে রান্না করে খাওয়াবে। এমন খাওয়া তো আমি কোন দিন খাইনি। আমাকে একটু আদর করবার কেউ নেই। দেখ, আমি দেখতেই আমি এত বড় হয়ে গেছি, কিন্তু আসলে ছোটই আছি। আমার একটা মা দরকার।

ভালুক কত করে তাকে বোঝাতে লাগল, কিন্তু কাঠুরে বউ তার কোন কথা শুনতে চাইল না। সে কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ভালুক যত মিষ্টি করেই বলুক না কেন, কোন মানুষ তার সংগে থাকতে চায়?

বহু কষ্টে রাতটা কেটে গেল। পরদিন সকাল হতেই ভালুক অনেক খেটেখুটে তার জন্য একটা ডালপালা জড় করে একটা চালার মত তুলে দিল। সে জানে, মানুষেরা খোলা আকাশের নীচে থাকতে পারে না। তারপর কাঠুরে বউর খাবার জন্য নানারকম ফলফলারী যোগাড় করে নিয়ে এল। কাঠুরে বউ কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, সে আর কাঁদতে পারে না। আর সে এখন এটুকু বুঝতে পারল যে, ভালুক তার কোন ক্ষতি করবে না। তখন সে অনেক মিনতি করে বলল, তুমি আমাকে আমার বাড়ীতে রেখে এসো। আমি এখানে থাকতে পারব না। কিছুতেই না।

ভালুক এমনিতে খুব ভাল। কি মিষ্টি তার কথা! কিন্তু ও কথায় সে কিছুতেই কান পাততে চায় না। বলে, না তা হয় না। আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়তে পারব না। তুমি দেখছ না, আমার কেউ নেই। তোমার কি আমার জন্য একটুও মায়া হয় না? তুমি আমাকে পিঠে বানিয়ে খাওয়াবে, আর আমাকে ভালবাসবে।

ভালুক রাত্রিবেলা বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে হামলা দেয়। লোকেরা তাকে দেখেই মারে, মারারে বলে দৌড় মারে। আর সেও সেই সুযোগে ঘর সংসারী করবার আর খাবার দাবার জিনিস যা পায়, সবকিছু লুটপুটে এনে কাঠুরে বউর ঘরে তোলে। তার সংসারে আর কোন কিছুরই অভাব রইল না। কিন্তু কাঠুরে বউর কোন কিছুতেই মন মানে না, সে খালি বলে, বাড়ী যাব। বাড়ী যাব।

দিনের পর দিন যায়। আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে কাঠুরে বউর ভয়ের ভাবটা কমে আসতে লাগল। আর কি আশ্চর্য, কেমন করে ভালুকের উপর একটু মায়াও যেন পড়ে গেল। কেমন করে যেন কথা বলে, কথাটা মনের মধ্যে গিয়ে বসে। রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারে না। সে ভালুককে নানারকম ভাল ভাল জিনিস রান্না করে খাওয়ায়। কিন্তু ভালুক পিঠে খেতেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসে।

কিন্তু ভালুক লক্ষ্য করে, কাঠুরে বউ দিন রাত কাঁদে, একটু আড়াল পেলেই কাঁদে। আরও দেখল, সে কিছুই খেতে চায় না। যা খায়, না-খাওয়ারই মত। না খেয়ে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ভালুক দেখে, আর তার মনটা ছটফট করে মরে। সে যে তাকে মায়ের মতই ভালবাসে। তার ভয় লাগে তার নিজের মায়ের মত এও আবার না মরে যায়।

সে বলল, মা তুমি খাওনা দাওনা, এ কেমন কথা? না খেলে কি কেউ বাঁচে? কাঠুরে বউ উত্তর দিল, আমার মরাই ভাল। স্বামীছাড়া হয়ে ঘরছাড়া হয়ে এই জংগলের মধ্যে বেঁচে থেকে আমার লাভটা কি? এই বলেই কাঠুরে বউ আবার কাঁদতে লাগল।

কিছুতেই যখন কিছু হোল না, কাঠুরে বউ মনে মনে একটা ফন্দি আঁটল। সে বলল, দেখ ভালুক, তুমি আমার

মা বলেছ, তুমি আমার ছেলের মত। তুমি আমার দুঃখটা বোঝ। দেখ, আমার স্বামীও আমার মত এমনি করেই কেঁদে মরছে। আসবার সময় চোখের দেখাটা পর্যন্ত হয় নি। না হয় তুমি আমাকে কিছু দিনের মত রেখে এসো। আমি তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আর সংসারটা একটু গুছিয়ে দিয়ে চলে আসব।

ভালুকের মনটা বড় নরম। মায়ের এত কান্না তার আর সহ্য হচ্ছিল না। সে একটু ভেবে বলল, নিশ্চয়। তোমার কাছে এই সত্য নিয়েই যাব।

ভালুক তো আর মানুষ নয়। মিথ্যে কথা কেমন করে বলে, সে কথা তো সে জানে না। মায়ের কথায় বিশ্বাস করে সে রাজী হয়ে গেল।

কিন্তু তুমি আবার ফিরে আসবে কবে? ভালুক জিজ্ঞেস করল।

কাঠুরে বউর মনটা আনন্দে নেচে উঠল। পশুজাতি তো আর মানুষের মত চালাক নয়। সে যা বলেছে তাই বিশ্বাস করে নিয়েছে। এখন কোন মতে একবার যেতে পারলে হয়।

সে বলল, একমাস বাদে আমাকে নিয়ে এসো।

ভালুক জিজ্ঞেস করল, একমাস কাকে বলে?

জানো না? শোনো তবে। দেখছ আজ সকালে আকাশে চাঁদ নেই, আজ হচ্ছে অমাবস্যা। কাল আবার ছোট্ট একটা চাঁদ উঠবে আর তা দিন দিন বড় হতে থাকবে। এই ছোট্ট চাঁদ বড় হতে হতে যে দিন পুরো গোল হয়ে যাবে, সে দিন পূর্ণিমা। পূর্ণিমার পরদিন থেকে চাঁদ আমার ছোট হতে হতে শেষে একদিন একদম মিলিয়ে যাবে। সেই দিন অমাবস্যা। সেই দিন তুমি আমাকে নিয়ে এসো।

ভালুক মায়ের কথা মেনে নিয়ে চুপি চুপি রাতের অন্ধকারে তাকে তার ঘরের কাছে রেখে এল। সত্য সত্যই কাঠুরে তার

বউর জন্য কেঁদে কেঁদে মরছিল। তার কিসের সংসারী আর কিসের কি। তার কোন কাজেই মন লাগে না। কাঠুরে বউ যখন ফিরে এল, তখন তাদের দুজনেরই কি আনন্দ।

এদিকে মাকে ছেড়ে ভালুকের দিন আর কাটে না। সন্ধ্যা হলেই তাকিয়ে দেখে চাঁদটা কত বড় হোল। আর চাঁদটাকে গাল দেয় কেন আরও তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু চাঁদ তার গাল শুনে ভয় পেল না। যেমন করে বাড়ছিল তেমনি করেই বাড়তে লাগল। দিন না গিয়ে উপায় নেই। ভালুকের চোখেও ঘুম নেই। সে একটু বাদে বাদেই চেয়ে দেখে চাঁদ আর একটু বড় হল কিনা। কিন্তু দিন যত আস্তেই যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাকে যেতেই হয়। না গিয়ে উপায় নেই। ক্রমে এল পূর্ণিমা, তারপর অমাবস্যা। সত্য সত্যই সেই অমাবস্যা ফিরে এল, ঠিক যেমন কথা মা বলেছিল, ভালুক আনন্দে মত্ত হয়ে নাচতে গাইতে লাগল, আজ তার মা আবার ফিরে আসবে।

ভালুক চলল তার মাকে আনতে। সারা পথ সে নাচতে নাচতে চলল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে, একি! কোথায় গেল ঘর? ঘরের চিহ্নটুকুও নেই, শুধু শূন্য ভিটেটা পড়ে আছে। এত আশা করে এসেছে সে! মনে মনে ভেবে আসছে মাকে দেখলেই দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু কোথায় মা? ভালুক হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

কাঠুরে আর কাঠুরে বউ ভালুকের ভয়ে এই যায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু কাঠুরে কাঠ বেচে খায়, বনের কাছাকাছি থাকাই তার সুবিধা। সে এখান থেকে দু ক্রোশ দূরে বনের আর এক ধারে গিয়ে তাদের ঘর বাঁধল। ভালুক আর এত দূরে তাদের পাত্তা খুঁজে পাবে না।

ভালুক মাকে না পেয়ে পাগলের মত হয়ে উঠল। কে তাকে পর পর দুবার এমন করে মাতৃহারা করল? না কিছুতেই

সে ছাড়বে না। যেখানে থাকুক, যতদূরে থাকুক, মাকে সে খুঁজে বের করবেই করবে। সে আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে মা মা করে বনে বনে ঘোরে। বনের পশুপাখীরা বলে, ভালুকের হোল কি?

সন্ধ্যা হতে না হতেই বন থেকে বেরিয়ে পড়ে আর যেথায় লোকের বসতি আছে, সেখানেই গিয়ে ঘরে ঘরে উঁকি মারে, দেখে সেখানে তার মাকে খুঁজে পায় কিনা। মাঝে মাঝে লোকজন টের পেয়ে দল বেঁধে তাড়া করে আসে। এক এক দিন মরতে মরতেও বেঁচে যায়। কিন্তু ওর বুঝি প্রাণের মায়াও নেই।

ওদিকে কাঠুরে আর তার বউ নতুন জায়গায় এসে সংসার পেতে বসেছে। সেই অমাবস্যার পর আর এক অমাবস্যা যখন ঘুরে এল, কাঠুরে বউ আর কিছুতেই সোয়াস্তি পায় না, কি জানি আজ কি হবে! সারাটি দিন আর সারাটা রাত তার ভয়ে ভয়ে কাটল। কিন্তু দিন আর রাত নির্বিঘ্নে কেটে গেল। ভালুক এল না। কেমন করেই বা আসবে? কেমন করে সে তাদের খুঁজে পাবে? কাঠুরে বউ হাফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু ওর কথা মনে করে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। সে যে তাকে মা বলে ডাকত। মায়ের মতো করেই ভালবাসত। আর সেই অতবড় বুনো জানোয়ার কেমন নরম আর মিষ্টি সুরে বলত, মা, আমার তো মা নেই, এখন তুমিই আমার মা। আমাকে ফেলে তুমি চলে যেও না। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।

এইভাবে এক অমাবস্যার পর আরও কত অমাবস্যা কাটল। আস্তে আস্তে কাঠুরে বউ ওর কথা ভুলে যেতে লাগল। তবু অমাবস্যা রাত্রিতে আকাশে যখন চাঁদ থাকে না, অন্ধকার রাত্রি যখন ঝিম ঝিম করতে থাকে, তখন ওর কথা মনে পড়ে যায়। তখন আর ভয় করে না। কিন্তু মনটা কেমন করে ওঠে, আহা ভালুক এখন জানি কি করছে, এতদিনে তার কথা হয়তো ভুলেই গেছে। বনের পশু, কতদিনই বা মনে রাখতে পারে।

সেদিনও এক অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি। দিনের বেলা কাঠুরে

বলেছিল, বউ, আজ পিঠে খাবার সাধ হয়েছে, আজ পিঠে বানাও, কাঠুরে বউ চমকে উঠল। আবার সেই পিঠে বানানো? সে বলে উঠল, না না, আমি পারব না।

কাঠুরে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন, কেন পারবে না?

সে বলল, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।

কাঠুরে বলল, আচ্ছা থাক তবে। আর একদিন হবে। কাঠুরে বাড়ী নেই। কাঠুরে বউ উনুনের পাশে বসে রান্না করছে। দরজার কাছে বাতিটা জ্বলছে, বাইরে ঘুটঘুটি অন্ধকার। কাঠুরে বউ উনুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। হঠাৎ দেখল তার সামনে বেড়াটার গায়ে প্রকাণ্ড বড় একটা ছায়া ভেসে উঠল। এ কি? কাঠুরে বউ ভয় পেয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল, ওরে মা ওটা কি? বিরাট কি যেন একটা দুই হাত বাড়িয়ে দুলতে দুলতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। আর কি? এযে সেই ভালুক। এখন? এখন সে কোথায় পালাবে? কাঠুরে বউ আতংকে চীৎকার করে উঠল।

ভালুক ডেকে বলল, মা, আমি এতদিনে তোমাকে খুঁজে পেয়েছি।

ঠিক এমনি সময় বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভালুক প্রাণফাটানো বিকট চীৎকার করে উঠল। সেই চীৎকারে নিঃশব্দ রাত্রির বুকটা যেন খান খান হয়ে গেল। ভালুকের সর্ব শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। তারপর সে উপুড় হয়ে কাঠুরে বউর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। কাঠুরের গায়ে বিষম জোর। আর তার বর্শাটা কি ধারালো! বর্শার এক ঘায়ে সে ভালুককে ঘায়েল করে ফেলেছে। ওর আর বাঁচতে হবে না। ভালুক হলে হবে কি, ঠিক মানুষের মতই লাল টকটকে তাজা রক্ত গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল।

কাঠুরে লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে বলল, কি, তোমাকে কিছু করতে পারেনি তো? ইস্, ভাগ্যিস্ আমি সময় মত এসে পড়েছিলাম।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে উঠতে কাঠুরে বউর একটু সময় লাগল। তার পরেই সে হুহু করে কেঁদে উঠল, তুমি একি সর্বনাশ করলে গো! আমার বাছাকে এমন করে মেরে ফেললে! তারপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল! কিন্তু ভালুক মার এত কাঁদাকাটিতেও কোন সাড়া দিল না। সে যেমন ছিল, তেমনই পড়ে রইল।

লাল গরুটা

লাল গরুটা বুড়ো হয়ে গেছে। দুধও দেয়না, কোন কাজেও লাগেনা। বাড়ীর কর্তা নিধিরাম বলল, এটাকে রেখে আর কি হবে? দু'চার টাকা যা পাই, তাতেই বিক্রী করে একটা দুধালো গাই কিনে নিয়ে আনাই ভাল। আমরা গরীব মানুষ, আমরা কি আর বাজার থেকে দুধ কিনে খেতে পারি?

নিধিরামের বউ বলল, এমন কথা বলোনা গো, অধর্ম হবে। আমার শাশুড়ীর বড় আদরের ছিল গরুটা। বড় লক্ষ্মী আর শান্তস্বভাব, একটু চুঁ-টাও মারে না। এ রকম গরু হয় না। এতকাল মায়ের মত আমাদের দুধ খাইয়ে এসেছে, আর এখন ক'টা টাকার লোভে আমরা ওকে কশাইয়ের কাছে বেচে দেব?

না না কশাইয়ের কাছে বেচব কেন? নিধিরাম বলল, যারা চাষবাস করে খায়, এমন লোকের কাছেই বেচব।

নিধিরামের বউ চাষীর ঘরের মেয়ে, চাষীর ঘরের বউ, সব খবরই রাখে। সে অবিশ্বাসের সুরে বলল, হ্যাঃ ওকে দিয়ে কি আর চাষের কাজ চলবে? বুড়ো হয়ে রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছে। দেখছোনা হাড় ক'খানা মাত্র বাকী আছে। যেই ওকে কিনুক, দু'দিন আগেই হোক আর পরেই হোক, কশাইয়ের কাছে বেচে দেবেই।

তবে করব কি? নিধিরাম একটু গরম হয়েই বলল, এই অকম্মা গরুকে আর কতকাল বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব? যাদের টাকার জোর আছে, তারা তা পারে। আমাদের গরীব মানুষের কি আর সেই সাধ্য আছে?

নিধিরাম মিছে কথা বলেনি। কিন্তু তার বউ কিছুতেই সে কথা শুনতে চায় না। সে বলল, দেখ, আমরাও একদিন বুড়ো হব, আমাদের ছেলে মেয়েরা যদি তখন বলে, তোমরা বুড়ো হয়ে গেছ, কোন কাজেই লাগনা। তোমাদের আমরা আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না। তখন আমাদের কেমন লাগবে? আর আমরা যাবই বা কোথায়?

মানুষ আর গরু এক নয়, এ ঠিকই কথা। কিন্তু নিধিরামের বউর মন কিছুতেই মানতে চায় না। আহা, এতদিনের গরুটা! সে বার বার কেবল এই কথাই বলে, আর নিধিরামের কাছে বকুনি খায়।

ছেলেমেয়েরা কথাটা জানতে পেরে চেচামেচি শুরু করে দিল। লালগরুটাকে ছেড়ে তারা কিছুতেই থাকতে পারবে না। বাড়ীশুদ্ধ সব একদিকে আর নিধিরাম একদিকে। কিন্তু নিধিরামের গোঁ বড় বিষম গোঁ। বাধা পেলে তার জিদ্‌টা আরও বেড়ে ওঠে।

নিধিরাম মুখটা ভারী করে বলল, আমার গরু আমি যা খুশী করব, তোমরা কেউ এর মধ্যে কোন কথা বলতে এসো না। আমিই ওকে কিনে এনেছিলাম, আমিই ওকে বিক্রী করব।

নিধিরামের পাঁচ বছরের ছেলে বিশু সটান দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল, আমার গরু। কাউকে বিক্রিরি করতে দেব না।

ওর মুখের ভাব আর কথার ভংগিতে এত দুঃখের মধ্যেও সবাই হাসল। বিশু কাউকে ভয় করে না। এমন যে বদমেজাজী বাপ, তাকেও না।

সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশু দ্বিতীয়বার গম্ভীর ভাবে তার ঘোষণা জানাল—আমার গরু।

তোর গরু? তোর গরু আবার কেমন করে হোল? নিধিরাম জিগ্যেস করল।

বিশু বলল, আমারইতো, আমি যে রোজ ওকে ঘাস খাওয়াই।

কিন্তু যে যতই বলুক না কেন, কারুই কোন কথা খাটল না। নিধিরাম লাল গরুটাকে মাত্র কুড়িটাকায় বিক্রী করে দিল। দু ক্রোশ দূরে সোনাকান্দা গ্রাম। সেখানকার একজন বুড়ো লোক তাকে কিনে নিয়ে গেল।

লাল গরুটার সাদা সরল মন। সে এত সব কিছু জানে না। ভাবতেও পারে নি। সারা জন্ম তার এই বাড়ীতেই কেটে গেল। এ সব বেচাকেনার খবর সে রাখে না। যে মানুষগুলিকে সে এত ভালবাসে, তারা যে তার সংগে এমন করতে পারে, সে তা কেমন করে বুঝবে? ভাবল, একটা বুড়ো লোক তাকে মাঠে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে চলেছে। অবশ্য তার সংগে ওর জানাশোনা নেই। নাই বা থাকল। ওর ঘাস খাওয়া নিয়ে কথা। সে কোন আপত্তি না করে দিব্যি তার পিছন পিছন চলে গেল। আর ঠিক সেই সময়টায় নিধিরামের বউ তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাশের বাড়ীতে চলে গিয়েছিল। এ কি চোখের সামনে দেখা যায়।

তারপর ফিরে এসে যখন শুনল লাল গরুকে নিয়ে গেছে, তখন বিশুর সে কি কান্না। তাকে সামলানো মুসকিল হয়ে উঠল। ছেলেমেয়েদের সবার মুখই ভার। ছেলেমেয়েদের মায়ের অবস্থাও তাই। সে দিন বাড়ীর কারুই ভালকরে খাওয়া হোল না। কিন্তু নিধিরামকে কেউ কোন কথা বলল না। কেউ কিছু বললে সে নিশ্চয়ই খুব রেগেমেগে উঠত। রাগবার জন্য মনে মনে তৈরী হয়েও ছিল। কিন্তু কেউ তাকে সেই সুযোগ দিল না। নিধিরাম এমন বিপদে আর কখনও পড়েনি। কি আশ্চর্য, এমন যে তেজস্বী নিধিরাম, সে যেন ঠাণ্ডা-জল হয়ে গেল। বাড়ীতে আর আসতে চায় না। চোরের মত এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়।

এর সাত আট দিন বাদে এক অবাক কাণ্ড। বিকাল বেলা লাল গরুটা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। নিধিরাম উঠানের ধারে বসে বেড়া বাঁধছিল। আর এদিক ওদিক নয়, লাল গরুটা সোজা তার

কাছে গিয়ে লম্বা মুখটা তার কাঁধের উপর তুলে দিল। ঠাণ্ডা নাকটা গায় লাগতেই নিধিরাম চমকে উঠল, এটা আবার কি? ওমা এযে লাল গরুটা। এ্যাঁ, কেমন করে এসে পড়ল? লাল গরু তার ডাগর ডাগর চোখ দুটি ওর মুখের দিকে তুলে ধরল। ওর চোখ দুটো যেন কথা বলছে। যেন বলছে, তোমার এ কেমন আক্কেল বলতো? আমাকে একা একা কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছিলে? আমি কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি? গরু তো মুখফুটে কথা বলতে পারে না। কিন্তু মনে মনে সে এই কথাই বলছিল।

তারপর তাকে নিয়ে বাড়ীশুদ্ধ হৈ হৈ পড়ে গেল। ছেলেমেয়েরা চেচামিচি, মাতামাতি নাচানাচি শুরু করে দিল। বিশু লাল গরুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমার গরু। সে দিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত লাল গরুর কথাই চলল। নিধিরাম কিন্তু মাথা নীচু করে চুপ করেই রইল। ভালমন্দ কোন কথা বলল না।

কিন্তু এ আনন্দ যে বেশী ক্ষণের জন্য নয়। পরদিন বেলাটা একটু উঠতেই সোনাকান্দা থেকে তিনজন লোক এসে হাজির। বুড়ো লোকটাও তাদের সংগে আছে। ওরা পালিয়ে যাওয়া গরুটার খোঁজে এসেছে। বিশু তার লাল গরুকে তখন ঘাস খাওয়াচ্ছিল। ওদের দেখেই গরুটার চোখে সে কি আতংক।

নিধিরামের সংগে সংগে দু একটা কথা বলে ওরা গরুটাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু সে কি যেতে চায়। চারটা পা খুঁটারমত শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। সে হয়তো মনে মনে আশা করছিল, নিধিরাম ওকে এসে সাহায্য করবে। সেই আশায় সে হা করে ডেকে উঠল। কিন্তু কেউ ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। ওরা তিন জন আর সে একা। কতক্ষণ আর ওদের রুখবে। ওরা তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। লাল গরু ফিরে ফিরে পিছন দিকে তাকাচ্ছিল। সবাই পরিষ্কার দেখতে পেল, ওর বড় বড় চোখ দুটি থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে। ছেলেমেয়েরা কেঁদে উঠল।

ওদের মা মুখ ফিরিয়ে মুখে কাপড় গুঁজল। আর নিধিরাম? নিধিরাম কি করল? সে হন্ হন্ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই যে গেল, গেলই, সারাদিন আর ফিরল না। নিধিরামের বউ গরুর চিন্তা ভুলে গিয়ে স্বামীর চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল। বলা নেই, কওয়া নেই, গেল কোথায়? এমন তো কোনদিন করে না।

সন্ধ্যা লাগে লাগে ঠিক এমন সময় নিধিরামের বাড়িতে গত দিনের মতই আবার হৈ চৈ পড়ে গেল। নিধিরাম ফিরে এসেছে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের এত আনন্দ সেই জন্যই কি? না, তা নয়। নিধিরাম লাল গরুটাকে সংগে করে নিয়ে এসেছে।

নিধিরামের বউ অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, এ আবার কি? নিধিরাম ঝাঁঝালো সুরে উত্তর দিয়ে বলল, কি করব? তোমাদের জ্বালায় কি আর পারবার উপায় আছে? গরুটা ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। উল্টে আরও দশটা টাকা গচ্চা লাগল।

গচ্চা লাগল কি রকম?

টাকা ফেরত দিতে গেলাম, আর ওরাও পেয়ে বসল। বলে, তোমার গরু আমাদের এই ক্ষতি করেছে, ওই ক্ষতি করেছে। ক্ষতির এক লম্বা ফিরিস্তি দিল। কি আর করব, শেষ পর্যন্ত আরও বাড়তি দশটা টাকা আদায় করে ছাড়ল।

নিধিরামের বউর চোখমুখ খুশীতে হেসে উঠল। কিন্তু সংগে সংগেই হাসিটা চাপা দিয়ে সে বলল, বিক্রী করেছিলে করেছিলে, আবার কি দরকার ছিল ফিরিয়ে আনবার? সত্যি কথাই তো, এই অকম্মা গরুটাকে কি দরকার আমাদের?

নিধিরাম এবার হেসে ফেলল। বাবাকে হাসতে দেখে ছেলে-মেয়েরাও সবাই তাকে ঘিরে ধরল। এক দিন বাবার উপর মনে মনে কি যে রাগ হয়েছিল! আজ সবার মন হালকা হয়ে গেছে। বাবাকে যত খারাপ মনে হয়, আসলে বাবা তত খারাপ নয়।

ভুলো আর রংগী

কুকুর থাকে ঘরের বাইরে। তাকে কেউ ঘরে ঢুকতে দেয় না। অবশ্য বিলেতী কুকুরদের বেলা অন্য ব্যাপার। তাদের সংগে কথা কি। ভুলো একদম দেশী কুকুর, একেবারেই আসল দেশী, একটু ভেজাল নেই। তার বারো বছরের মনিব নীলু তাকে কোথায় থেকে জোগাড় করে নিয়ে এসেছিল, ভুলো এখন আর সে কথা মনে করতে পারে না। সেই থেকে নীলুই তাকে একটু একটু করে বড় করে তুলেছে।

নীলুর মত এমন ভাল মানুষ সারা পৃথিবী খুঁজলে মিলবে না, একথা ভুলোর ভাল করেই জানা আছে। সেই তো রোজ তাকে নিজের হাতে খেতে দেয়। মাঝে মাঝে আবার দু একদিন স্নান করিয়ে দেয়। দেশী কুকুরদের অবশ্য স্নান করতে নেই। কিন্তু নীলুকে সে কথা কিছুতেই বোঝানো যাবে না। নীলুর ওই একটি মাত্র দোষ। তা একটু আধটু দোষ মানুষ মাত্রেরই থাকে। বাইরের ঘরে বারান্দাটার এক কোণে একরাশ শুকনো পাতা বিছিয়ে তার উপর একটা পুরু বস্তা পেতে দিয়েছে নীলু। গদীর মত নরম। তার উপর শুয়ে ঘুমোতে কি আরাম। ঘরের মধ্যে নাইবা ঢুকতে পারল সে, কি হয়েছে তাতে?

কিন্তু অসহ্য লাগে তখন, যখন ওই রংগী বেড়ালটা ওর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে। ভাবটা এই, দেখ দেখি, আমি কেমন আছি। দিদিমণিদের কাছে 'নাই' পেয়ে পেয়ে ওর পায়া বড় বেড়ে গেছে। শুধু কি তাই? শুধু যদি হাসতই, ভুলো

না হয় চুপ করেই সহ্য করে যেত, দেখি-না, না দেখি-না করেই থাকত। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন চটাং চটাং কথা বলে, যে তখন সারা গায়ে আগুন জ্বলতে থাকে।

একদিন কিছুর মধ্যে কিছু না, হঠাৎ বলে বসল, এই ভুলো, তুই আমাদের খাওয়ার সময় চৌকাঠের সামনে নোলাটা বের করে চেয়ে থাকিস্ কেনরে? খাওয়ার সময় অমন করে দিষ্টি দিলে পেট ক'াপবে না? রাগে ভুলোর সারা গা রি রি করে উঠল। হতচ্ছাড়া বলে কি? সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে ওঠে, থাম তুই কেঁচকিমুখী, তোর কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আর একটা কথা বলবি তো তোর ওই মুখটা দেয়ালের গায়ে ঘসে একদম পালিশ করে দেব। রংগী কথা শুনে পিঠ ফুলিয়ে ওঠে, বলে ও'-ও-ও, এই তো বললাম কথা। আয়না দেখি, দেখি কেমন তোর মুরোদ। কিন্তু যত রাগই হোক না কেন, সত্য সত্যই ভুলো তো আর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে না। তখন মনটা বড়ই খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু যে যাই বলুক না কেন, রান্নাঘরের চৌকাঠটা ঘেঁসে দাঁড়াতেই হবে তাকে। এ না করে পারে না। এ ঘর থেকেই তো নীলু তার জন্য ভাত নিয়ে এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবে। সে সময় ওখানে না দাঁড়িয়ে থাকলে চলে? তা ছাড়া নীলু স্কুলে যাওয়ার পর ক্রমে ক্রমে বাড়ীর আর সবাই খায়। তখন কেউ কেউ কখনো সখনো তার কথা মনে করে দু এক মুঠ নিয়ে আসে। তখন ভুলো লেজ নাড়তে নাড়তে তার পিছন পিছন যায়। কে কোনদিন দেবে না দেবে, তার তো বাঁধা ধরা নিয়ম নেই, তাই দুপুর বেলায় খাওয়ার সময়টায় রোজই তাকে ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে হাজিরা দিতে হয়। কপালে থাকলে জোটে, না থাকলে জোটে না।

আর একদিন হয়েছে কি, খাবারের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন

মনের ভুলে, ম'থাটা আর সামনের পা দুটো চৌকাঠ ডিংগিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সব সময় কি অত খেয়াল থাকে? কারুর নজরে পড়েনি, কিন্তু রংগীটার সব কিছুতেই ফোঁপড় দালালী, সে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, এই ভুলো, একেবারে যে ঘরের মধ্যেই এসে পড়েছিস। বড় বাড় বেড়েছে তো। গেলি?

কাজটা যে বে-আইনী হয়েছে, এ বোধ ভুলোর ছিল। কিন্তু তাই বলে রংগীর এমন কথার পর কি সংগে সংগেই হটে যাওয়া যায়! মেয়েটা হাসবে না? তাই একটু জেদ করেই দাঁড়িয়ে রইল সে, একটুও নড়ল না। কিন্তু কি কপাল, ঠিক এই সময়ই নীলুদের ঝী মাতারীর চোখ পড়ল তার উপরে। সে খ্যান্ খ্যান্ করে উঠল, দেখছ, কুকুরটার কাণ্ড দেখেছ, একেবারে ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে! বলেই সে একটা লাঠি নিয়ে ভুলোর উপর এক ঘা বসিয়ে দিল। ভুলো কেঁউ কেঁউ করে পিছিয়ে এল। কিন্তু কি লজ্জা, রংগীর চোখের সামনেই ব্যাপারটা ঘটে গেল, রংগী একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ল, আর বলতে লাগল, কেন, আগেই বলেছিলাম না? এখন হোল তো। যেমন কুকুর তেমন মুগুর। এমন ভাবে কাটাঘায়ে নুনের ছিটা পড়লে কেমন লাগে! কিন্তু উপায় কি? মুখ বুঝে সবই হজম করতে হয়।

এই ভাবেই দিন যাচ্ছিল। মনে মনে যত তর্জন-গর্জনই করুক না কেন, রংগীকে এঁটে ওঠা ভুলোর সাধ্য নয়। সে যেন পরিবারের একজন হয়ে বসেছে। তাই তার সংগে ঠোকাঠুকি করতে গেলে ভুলোকেই পদে পদে নাকাল হতে হয়। অথচ রংগীর চেয়ে তার গায়ে কত বেশী জোর! কিন্তু গায়ের জোর দিয়ে সব কিছু চলে না। কপাল, কপাল, সব কিছুই কপালের খেলা। এই বলে ভুলো নিজের মনকে বুঝ দেয়।

কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়। সব কিছুই কপালের খেলা। শেষ পর্যন্ত তাই দেখা গেল। কপালের জোরেই রংগীর এত বড় বাড়ন্ত আর দবদবানি। সেই কপাল তার ভাংগল। নীলুর বাবা

এলেন মাসখানেকের ছুটি নিয়ে। অনেক দূরদেশে কাজ করেন ভদ্রলোক, যখন তখন আসতে পারেন না। এবার কয়েক বছর বাদে এসেছেন। রংগী তাকে চেনে না। বাড়ীশুদ্ধ তাকে নিয়ে হুলুস্থুল। রংগী আর ভুলোর দিকে দৃষ্টি দেবার মত সময় কারুর নেই। রংগীর মনটা তাই একটু ভার। কিন্তু পেটে ক্ষিদে চাপলে মন ভার করে বসে থাকা চলে না। তাই নীলুর বাবা যখন খেতে বসেছেন, রংগী তখন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসে তাঁর পাশ ঘেঁসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে বলল, ম্যা-ও অর্থাৎ একটু কিছু দাও গো বাপু।

নীলুর বাবা রংগীকে দেখেই বিষম আঁতকে উঠলেন। তিনি ডাক্তার মানুষ। কি থেকে কি হয়, সে কথা তিনি ভাল করেই জানেন। সেই জন্যই বিড়ালকে তিনি বাঘের মতই ভয় করেন। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে তিনি তার চটিটা তুলে ইচ্ছামত দু'ঘা রংগীর পিঠের উপর ঝাড়লেন। রংগী বাড়ার আদুরে বিড়াল। মারপিট জিনিসটা যে কেমন সেই ধারণা তার ছিল না। প্রথমটায় সে একেবারে বুদ্ধি হারিয়ে থ খেয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় মারটা পড়তেই তার বুদ্ধি ফিরে এল। সে একলাফে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়ল। তারপর ছুট্ ছুট্ ছুট্।

রংগীর উপরে ঝাল ঝেড়েও নীলুর বাবা শান্ত হলেন না। ডাক্তারের বাড়ীতে বেড়াল। এ কেমন করে হয়? তিনি বেদম চেঁচামেচি করতে লাগলেন। ছেলেমেয়েরা বাবার পাশে বসেই খাচ্ছিল। বাবার অগ্নিমূর্তি দেখে তারা ভয়ে খাওয়া বন্ধ করে হাঁ করে রইল। নীলুর মা ভাত আনতে গিয়েছিলেন, তিনি চেঁচামেচি শুনে ছুটতে ছুটতে এসে জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বাড়ীতে বেড়াল কেন? নীলুর বাবা হুংকার দিয়ে উঠলেন। কথা শুনে নীলুর মা অবাক হয়ে গেলেন, বিড়াল আছে তো কি হয়েছে?

কি হয়েছে। জান, বিড়াল কি সর্বনেশে জিনিস? বিড়াল ডিপথিরিয়ার জীবাণু বহন করে। এতগুলি ছেলেপিলের মা তোমার প্রাণে ভয় নেই?

নীলুর মার প্রাণে এতদিন সত্যিই কোন ভয় ছিল না, এবার ভয় এল। তিনি বললেন, ডিপথিরিয়া কি গো?

ডিপথিরিয়া জানো না? এ শিশুদের এক মারাত্মক রোগ। প্রথমে গলা ফুলবে, তারপর দমবন্ধ, ছটফটানি, তারপর একদম খতম। আমাদের ওখানে এক বাড়ীতে এক ভদ্রলোকের সাত সাতটা ছেলেমেয়ে একই দিনে পট্‌পট্‌ করে মরে গেল।

এ্যাঁ কি সর্বনেশে কথা! নীলুর মা মাথায় হাত দিয়ে বললেন। সে দিন থেকেই নীলুর বাবার আদেশ জারী হয়ে গেল। বাড়ীতে রংগীর প্রবেশ নিষেধ।

রংগী ব্যাপারটার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারল না। হঠাৎ কেন এমন হয়ে গেল। ঘরের কাছে গেলে সবাই দূর দূর করে তাড়া করে আসে। তার এতদিনের ঘর, সেই ঘরে সে ঢুকতে পারে না, একি অন্যায় কথা! সে দশজনের মধ্যে থাকতে ভালবাসে, সেই রকম থাকাটাই তার অভ্যাস। এখন সারাদিন বাইরে বাইরে ঘোরে। রাত্রিবেলা চোরের মত চুপিচুপি ঘরের মধ্যে গিয়ে শুয়ে থাকে, আর ভোর হতে না হতেই উঠে পালায়।

তবু রক্ষা, ছোট দিদিমণি তার কথা একেবারে ভুলে যায় নি। নয়তো না খেয়েই তাকে মরতে হোত। ছোট দিদিমণি রোজ চুপিচুপি এসে তার জন্য এক জায়গায় খাবারটা রেখে ডাক দেয়—রংগী, রংগী আয় চুচ্‌ চুচ। রংগী এই সময়টায় কাছে কাছেই থাকে। ডাক শুনলেই ছুটে আসে। কিন্তু ছোট দিদিমণিও যেন কেমন হয়ে গেছে! খাবার রেখেই সে চলে যায়, আদর করবার জন্যও একটু দাঁড়ায় না। দুঃখে অভিমানে রংগীর মনটা ভারী হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মনে হয়, রাগ করে খাবে না। কিন্তু ক্ষিদে পেলে

না খেয়ে থাকা যায় না।

সব চেয়ে খারাপ কথা, ভুলো ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছে। চলতে ফিরতে দেখা হলেই দাঁত বের করে হাসে। ওর ওই হাসি দেখলে রংগীর পিত্তি জ্বলে যায়। কিন্তু কি আর করা যাবে, সুযোগ পেয়েছে যখন, একটু তো হাসবেই। সে সহজে ভুলোর মুখোমুখী হতে চায় না, দূর থেকে দেখলেই একদিকে সরে পড়ে।

একদিন দুজন হঠাৎ একেবারে মুখোমুখী পড়ে গেল। পালাবার পথ ছিল না। ভুলো বড় খুশী, এতদিনে তার দুঃখ মিটেছে। হাসতে হাসতে বলল, কিগো ঠাকরুন, এমন বাইরে বাইরে কেন? যাওনা একবার তোমার ঘরে। লজ্জায় অপমানে রংগীর চোখ ফেটে জল আসছিল, সে ভাংগা গলায় কাঁদো কাঁদো সুরে বলল, পথ ছাড় পোড়ামুখো। কিন্তু পোড়ামুখো পথ ছাড়ল না। সে মনের আনন্দে লেজ দোলাতে দোলাতে বলল, আহা, এতদিন বাদে তোমার কাছে পেলাম, এসোনা একটু সুখদুঃখের কথা বলি। রংগীর আর সইল না। তার পিঠ ফুলে উঠল, ও-ও-ও! সংগে সংগে ভুলোর দুই দুই গালে দুই চড়! ভুলো এরকম একটা ঘটনার জন্য একদম তৈরী ছিল না। নখের আঁচড় খেয়ে কেঁউ কেঁউ করে সে দুপা পিছিয়ে গেল। সেই সুযোগে রংগী লাফ মেরে আমগাছটার কাছে গিয়ে পড়ল, তারপর তড় তড় করে করে একদম গাছের মাথায়।

সামান্য একটা মেয়ের হাতে এরকম লাঞ্ছনা পেয়ে ভুলো রীতিমত ক্ষেপে উঠল। সে সামনের দুটো পা দিয়ে গাছের গায়ে ভর রেখে মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল আর চেঁচাতে লাগল এই রাক্ষসী আয় না দেখি, একবার নেমে আয়। যদি সাহস থাকে নেমে আয়। রংগী কোন সাড়া দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

ভুলো জানত না যে তার দুর্দিনও ঘনিয়ে আসছে। এ সব জিনিস আগে থাকতে বোঝা যায় না তো। রাত্রিবেলা নীলুর বাবার সঙ্গে সবাই খেতে বসেছে। ভুলো তার রোজকার নিয়ম মত চৌকাঠের

সামনে বসে মন দিয়ে তাদের খাওয়া দেখছিল। দেখতে দেখতে কখন সে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খাওয়ার স্বপ্ন দেখছিল। এমন সময় কি একটা জানোয়ার তার উপর এসে পড়ল, ভুলোর মনে হোল তার চাপে তার হাড়গোড় যেন থেঁতলে গেছে। অসহ্য ব্যথায় চীৎকার করে মরিয়া হয়ে সেও সেই জানোয়ারটাকে কামড়ে ধরল। আর তার পরেই তার উপর দিয়ে যা সব কাণ্ড ঘটতে লাগল, ভুলো তা কোন দিন তা ভুলতে পারবে না। এই দুঃসময়ে কোথায় গেল নীলু ?

ব্যাপারটা হয়েছিল এই। নীলুর বাবা খাওয়া দাওয়া করে অন্ধকার চৌকাঠের বাইরে পা দিতেই ভুলোর উপরে হোঁচট খেয়ে পড়েছিলেন। আর ভুলোও আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে তার পায়ে দাঁত বসিয়ে দিল। ফলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড। তার প্রতিফলটা ভুলো হাতে হাতেই পেয়ে গেল। সেই বেদনা এখনও ওর গায়ে লেগে রয়েছে।

সবাই বলল, কি জানি কুকুরটা পাগল হয়ে গেল নাকি ? ও কখনই কামড়ায় না। কেউ কেউ বলল, ওকে মেরে ফেলাই ভাল। কিন্তু নীলু কেঁদে কেটে একাকার। ফলে সেই প্রস্তাবটা চাপা পড়ে গেল। ছেলের কান্না দেখে নীলুর বাবা বললেন, থাক, কদিন দেখো। তবে কুকুরটাকে কাছে আসতে দিও না। তিনি তার পরদিনই শহরে চলে গেলেন পাগলা কুকুরে কামড়ের টীকে নেবার জন্য। তার এবারকার ছুটিটা নেহাৎ মাঠেই মারা গেল। ফলে সবাই এই অলুক্ষুণে কুকুরটার উপর হাড়ে হাড়ে চটে গেল। দেখলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করে আসে। নীলুও অবস্থা দেখে তার পক্ষ হয়ে কিছু করতে সাহস করল না। ভুলোর নীলুর উপর মনে মনে অনেক ভরসা ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে বুঝল যে, এ সংসারে কেউ কারুর নয়।

সারাটা দিন এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে তার দিন কাটল। খিদেয়

পেট ভোঁ ভোঁ করছিল, সে একটা চারা গাছের পাতা খেয়ে দেখল। একটুও ভাল লাগল না। হাঁটতেও ভাল লাগে না, বসতেও ভাল লাগে না, শেষ কালে একটা গাছের তলায় চুপ করে শুয়ে পড়ল। তার কেবলই কান্না পাচ্ছিল।

রংগী কিন্তু সেই গাছটার উপরেই বসেছিল। মোটামুটি ভুলোর সব খবরই সে রাখে। ভুলোর মুখের ভাব দেখে তার অবস্থাটা ওর আর বুঝতে বাকী নেই। কি আশ্চর্য, ওর চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। ভুলোর ঘুম ঘুম করছিল। হঠাৎ 'মিউ' শুনে চমকে উঠল, একি এ যে স্পষ্ট রংগীর ডাক। চোখ মেলে চেয়ে দেখল মাত্র কয়েক হাত দূরে রংগী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকেই দেখছে। ও মজা দেখতে এসেছে বুঝি! রাগে তার রক্ত টগবগ করে উঠল। সে ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাংলো। সে পরিষ্কার দেখতে পেল রংগীর চোখ থেকে যেন দুঃখ, অনুতাপ আর সমবেদনা ঝরে পড়ছে। যেন সে বলছিল, আমি আগে তোমার উপর অনেক অন্যায় করেছি। সে কথা ভুলে গিয়ে আমাকে ক্ষমা কর। আজ যে আমরা দুজনেই সমান দুঃখী।

একি সেই রংগী? এও কি সম্ভব? ভুলোর চোখ দুটি আপনা থেকেই কোমল হয়ে এল। রংগী বুঝল। এতক্ষণ সে ভয়ে এগোতে পারছিল না। এখন সে নিশ্চিন্ত মনে সামনে এসে ওর নরম থাবাটা ভুলোর গায়ে ঘসতে ঘসতে বলল, যা হবার হয়ে গেছে ভাই। ওসব কথা ভেবে আর দুঃখ পেও না। ওদের ভালবাসা শুধু সখের ভালবাসা। এর ওপর কোন বিশ্বাস আছে? গরীবের দুঃখের মর্ম শুধু গরীবেই বোঝে।

নেকড়ে বাঘের বাচ্চা

নেকড়ের বাচ্চাটা জন্মাবার কয়েক দিন পরেই মরে গেল। নেকড়ে তার বাচ্চার শোকে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়ায়। আহা, কি সুন্দর ডাগর ডাগর বাচ্চাটা। কেমন কুঁত কুঁত করে চাইত, আর টলমল করে হাঁটত। কত নেকড়ে তো আছে বনে, কিন্তু কই কারুর বাচ্চাতো এমন হয় না। এমন বাচ্চাটা মরে গেল, ওর মা কেমন করে সইবে?

নেকড়ে এদিকে যায়, ওদিকে যায়, সারাদিন কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কিছুতেই আর শান্তি পায় না। পাঁচটা না, সাতটা না, একটা মোটে বাচ্চা, তাও মরে গেল! একা একা ও আর থাকতে পারে না।

একদিন চলতে চলতে হঠাৎ সে চমকে উঠল। দেখে ঝোপের ধারে একটা বানরছানা বসে বসে খুব মন দিয়ে পেট চুলকোচ্ছে। একদম কচিবাচ্চা। খেলতে খেলতে দল ছেড়ে একটু দূরে চলে এসেছে। ওকে দেখেই নেকড়ের মনে পড়ে গেল তার সেই মরে যাওয়া বাচ্চাটার কথা। আর যেই না মনে পড়া, অমনি কি যে তার হোল, সে বাচ্চাটাকে কামড়ে তুলে নিয়ে ঘরের দিকে ছুট মারল।

বাচ্চাটা ভয়ে কিচমিচ করে ওর গলায় যত জোর আছে, তাই নিয়েই চেঁচিয়ে উঠল। ওর চীৎকার শুনে ওর মা আর আর সব বানরেরা যে যেখানে ছিল, সবাই দল বেঁধে তেড়ে এল। কিন্তু এলে কি হবে? নেকড়ে ততক্ষণে ওকে নিয়ে তার গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

সেই অন্ধকার গর্তের মধ্যে এসে বাচ্চাটা ভয় পেয়ে 'মা মা' বলে কাঁদতে লাগল। নেকড়ে বলল, কাঁদিসনে বাছা। আমি এখন তোর মা। নে, এখন শান্ত হয়ে বসে একটু দুধ খা।

বাচ্চা বলল, না না, তুমি কেন আমার মা হবে? আমার মা কত সুন্দর। তুমি কে? তুমি কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলে?

নেকড়ে ওকে অনেক করে বোঝাতে লাগল। কিন্তু বোঝালে কি হবে? তাকে মা বলে ডাকল না, তার দুধও খেল না। ও শুধু এই কথাই বলতে লাগল, না না, তুমি তো আমার মা নও। তোমার দুধ আমি কেন খাব?

পুরো একটা দিন কাঁদতে কাঁদতেই গেল। কিন্তু ক'দিন আর এভাবে কাঁদবে? সব জিনিসেরই শেষ আছে। আস্তে আস্তে সে তার আগেকার সব কথাই ভুলে গেল। নেকড়েকেই সে এখন তার মা বলে জানল। এখন আর ওর মনে কোনই আফশোষ নেই। নেকড়েও তাকে নেকড়ের বাচ্চার মতই বড় করে তুলল। বাচ্চাও এখন আর গাছে ওঠে না। গাছে উঠতে যেন ভুলেই গেছে। সে দিনরাত তার নেকড়ে-মার পিছন পিছন ঘুরে বেড়ায়।

একদিন সে তার নেকড়ে-মার সংগে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় তার বিষম পিপাসা লাগল। ও বলল, মা বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল খাব। নেকড়ে-মা বলল, যা, ওই যে ডোবাটা আছে ওখানে গিয়ে জল খেয়ে আয়। ও বলল, তুমি আমার সঙ্গে চল মা, আমার একা যেতে ভয় করে।

ভয়? ভয় আবার কিসের? বড় হয়েছিস না এখন? এই তো কাছেই ডোবাটা। যা আমি এইখানে থেকে চেয়ে আছি। কি আর করে! বাচ্চা আস্তে আস্তে ডোবার ধারে গেল। কিন্তু যেই না জলের ধারে মুখ নামিয়েছে, অমনি লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল আর বিষম ভয় পেয়ে কিচমিচ করে উঠল। ওর চেঁচানি শুনে ওর নেকড়ে-মা এক ছুটে ডোবার ধারে এসে জিগ্যেস করল, কি

রে, কি হয়েছে ? অমন করছিস কেন ?

বাচ্চা কাঁপতে কাঁপতে বলল, দেখনা, ওই জলের মধ্যে একটা কি ? নেকড়ে-মা জলের ধারে গিয়ে বলল, কই, কি আবার, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। কি যে ভীতু হয়েছিস তুই। শুধু শুধুই ভয় পাস।

বাচ্চা নেকড়ে-মায়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল, দেখ না তুমি, জলের মধ্যে বানরের মত একটা কি। আমাকে দেখে ভেংচি কাটছে।

নেকড়ে এবার বুঝতে পারল, বাচ্চা তার নিজের ছায়া দেখে ভয় পেয়েছে। বাচ্চা জানে সে নেকড়ের বাচ্চা নেকড়ে। সে যে বানর, এ কথা সে কেমন করে জানবে। নেকড়ে ওর কাণ্ড দেখে মনে মনে হাসল। শেষে বলল, দূর বোকা, ও তো একটা বানর। ও তোর কি করতে পারবে ?

বাচ্চা বলল, বানর কেমন করে হবে ? বানর তো গাছে থাকে। নেকড়ে ওকে বুঝিয়ে দিল যে এক রকম বানর আছে, তারা জলেই থাকে। এ হচ্ছে তাই। এদের নাম জলবানর।

বাচ্চা মার মুখে যা শুনল, তাই বিশ্বাস করল। কেনই বা বিশ্বাস করবে না ? মা কি আর মিছে কথা বলবে ?

এর কিছুদিন বাদে একদিন সে একাই বেরিয়েছিল। মা ছিল না সাথে। একটা বনডুমুরের গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় উপর থেকে একটা বানর তাকে ডেকে বলল, এই বাচ্চা, তুই বানরের বাচ্চা হয়ে নেকড়ের পিছন পিছন ঘুরিস, তোর লজ্জাও হয় না ? বেইমান কোথাকার।

বাচ্চা ওর কথা শুনে অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, তুমি কি সব যা-তা বলছ ? কে বানরের বাচ্চা, আমি তো নেকড়ের বাচ্চা নেকড়ে।

বানর হেসে উঠল। সে হাসি আর থামতে চায় না। শেষে হাসি থামিয়ে বলল, হাসালি তুই। বানরের ঘরে যে এমন বোকাও জন্মায়,

তা তো জানতাম না। নেকড়ের পিছন পিছন ঘুরলে কি হবে, তুই আমাদেরই মত বানর।

বাচ্চা কিছুতেই এ কথা মানল না, বলল, না আমি নেকড়ে। আমি কেন বানর হব?

বানর ডেকে বলল, উপরে আয়, তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোর দেহের সবটুকুই বানর, একটুকরোও নেকড়ে নয়।

বাচ্চা বলল, আমি নেকড়ে, আমি তো আর গাছে উঠতে পারি না। তুমি নীচে নেমে এসে কি বলবে বলো।

বানর তার এই কথা শুনে নীচে নেমে এসে তাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল যে, সে সারা দেহেই বানর, একেবারে খাঁটি বানর। নেকড়ে তাকে ভুল বুঝিয়েছে।

বাচ্চা প্রশ্ন করল, নেকড়ের পেটে কি কখনও বানর হয়?

বানর বলল, না, তা হয় না। কিন্তু তুই তো নেকড়ের বাচ্চা মোটেই নস্। তুই ষোল আনা বানরের বাচ্চা।

এমন অদ্ভুত কথা বাচ্চা আর কখনও শোনেনি। সে বলল, তোমার মুখের কথায় আমি বিশ্বাস করি না। প্রমাণ করে দেখাও যে আমি বানর।

বানর একটু ভাবল। শেষে বলল, আচ্ছা চল ওই ডোবার ধারে।

দুজনেই ডোবার ধারে গেল। বানর বলল, এবার জলের মধ্যে চেয়ে দেখ, ওটা কি?

বাচ্চা বলল, ওটা তো জলবানর। বানর তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল, জলবানর? সেটা আবার কি? ওরে হাঁদা, এইটেই তো তোর চেহারা, এ তো তোর ছায়া। কেমন, বাঁদর নস্ তুই?

বাচ্চা কিছুতেই ওর কথা মানল না। সে বলল, আমি তো এখানেই আছি। আমি ওখানে যাব কি করে? আর আমি বুঝি ওর মত বিচ্ছিরি দেখতে?

বানর বলল, কি মুসকিলেই পড়লাম তোকে নিয়ে। আচ্ছা, তুই হাঁ কর দেখি।

বাচ্চা হাঁ করল। বানর আংগুল দিয়ে দেখাল, ওই দেখ, ওটাও হাঁ করছে। সত্যিই তো?

তুই তোর ডান হাতটা তোল। বাচ্চাটা তার ডান হাত তুলল।

দেখেছিস্ ওটাও ওর ডান হাত তুলছে। সত্যিই তো?

বানর বলল, এখন বুঝলি তো, ওটা তুই নিজেই। ওর নাম ছায়া।

বাচ্চা বলল, না, না, আমি কেন হব? ও জলবানর। ও আমাকে ভয় দেখাচ্ছে।

বটে ভয় দেখাচ্ছে? দেখ তো ওর পাশে দাঁড়িয়ে কে? আমি না?

সত্যিই তো। এবার বাচ্চা আর কোন কথাই বলতে পারল না। সে ছুটতে ছুটতে একদমে মায়ের কাছে এসে হাজির।

এসেই সে মায়ের কাছে সব কথা খুলে বলল। মা প্রথমে কথাটা চাপা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না। বাচ্চা তাগিদের পর তাগিদে ওর মুখ থেকে সত্য কথাটা আদায় করে ছাড়ল।

সেই দিন থেকেই বাচ্চার মন গেল বদলে। নেকড়ের উপর মনে মনে তার রাগ জমে উঠতে লাগল। কেন সে তাকে তার নিজের মার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল? তাই তো সে আজ তার আপন জনদের কাছ হতে কত দূরে সরে পড়েছে।

যতই দিন যেতে লাগল, ততই তার মনে হতে লাগল, বানর জাতটা মোটেই অসুন্দর নয়। আর ঠিক সেই পরিমাণে নেকড়ের চেহারাটা তার কাছে দিন দিনই বিদ্‌ঘুটে বলে মনে হতে লাগল। অবশেষে একদিন সে মনে মনে স্থির করল, এখানে সবই যখন ফাঁকি, তখন কি হবে এখানে থেকে? সে তার আপন জনদের কাছেই ফিরে যাবে।

আবার একদিন সেই বানরের সংগে দেখা। ও তাকে বলল, তুমি সেদিন যা বলেছিলে, তার সবই ঠিক।

সবই যদি ঠিক হয়, তবে চল আমার সংগে। নেকড়ের সংগে বানরের বনবে কেন? তোর নিজের সমাজে ফিরে চল।

বাচ্চার মনে হোল এই কথাই তো ঠিক। শেষে একদিন সে সেই বানরের সংগে চুপচাপ সরে পড়ল। যাবার আগে নেকড়ে-মাকে একবার বলেও গেল না।

বাচ্চা যখন বানরের দলবলের মাঝখানে এসে পড়ল, তখন তাকে নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন দেখা দিল। সর্দার বানর জিগ্যেস করল, তুই আগে কোন দলে ছিলি?

দলাদলির খবর বাচ্চা কি জানে? সে বলল, আমি তা কেমন করে বলব?

সবাই বলল, তাই তো!

তখন সমস্ত বানরীকে এক একজন করে ডেকে ডেকে দলপতি জিগ্যেস করল যে এ তাদের বাচ্চা কিনা? কিন্তু তারা কেউ সে কথা স্বীকার করল না।

দলপতি বলল, এর বংশ গোত্র কিছুই আমরা জানি না, একে আমরা কি করে আমাদের সমাজে ঠাঁই দিতে পারি?

সবাই বলল, তাই তো!

কিন্তু একটা বুড়ো বানর বলল, তোমরা যা বলছ, তা সবই ঠিক। কিন্তু এইটুকুন বাচ্চা, ওকে যদি আমরা জায়গা না দেই, তবে ও কোথায় যাবে?

সবাই বলল, তাই তো!

কিন্তু আর একজন আর এক কথা বলল, ওর চালচলন আমাদের মত নয়। দেখ না, নেকড়েদের মত করে হাঁটে, গাছেও উঠতে পারে না। বানর-সমাজে ও কেমন করে থাকবে?

বুড়ো বানর বলল, ও তো বাচ্চা। ওসব দুদিনে ঠিক হয়ে যাবে। ওর জন্য ভাবছ কেন?

প্রায় সবই ঠিক হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ এক জায়গায় একটা বিষম খটকা লেগে গেল। সর্দার জিগ্যেস করল, তুই তো এইটুকুন বয়স থেকেই নেকড়ের কাছে ছিলি। দুধ-টুধ-খাস্‌নি তো?

বললেই হতো খাইনি। কিন্তু বাচ্চা কেমন করে বুঝবে? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ, খুব খেয়েছি। সে তো আমার মায়ের মতই ছিল। তার দুধ খেয়েই তো বড় হয়েছি।

এই কথাটার উপর সবাই এক সংগে প্রবলভাবে কিচমিচ করে উঠল। সবাই বলল, নেকড়ে বাঘের দুধ খেয়ে যে বড় হয়ে উঠেছে, সে কি আর বানর আছে? সেতো আধা নেকড়ে আর আধা বানর। বানর সমাজে তার কোনমতেই স্থান হতে পারে না। দলপতি জানিয়ে দিল, আমাদের দলে তোমার যায়গা হবে না। তুমি তোমার পথ দেখ।

বাচ্চা বলল, বা রে, আমি তবে কোথায় যাব?

সর্দার উত্তর দিল, জায়গার কি আর অভাব আছে? কত বন পড়ে আছে, যেখানে খুশী চরে খাও গে।

বাচ্চা এখন কি আর করবে? মনের দুঃখে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সে গাছে উঠতে শিখল। এখন লাফিয়ে লাফিয়ে এ ডাল থেকে ও ডালে, এ গাছ থেকে ও গাছে যেতে পারে। এখন সে পুরোপুরি বানর হয়ে উঠল। কিন্তু তবু কোন বানরের দলে তার জায়গা হোল না। যাদের কাছে যায়, তারাই দূর দূর করে। বলে, ওটা একটা দলছাড়া একাচোরা বানর। ওকে জায়গা দিসনে।

বনে খাবারের কোন অভাব নেই। কত গাছে কত রকম ফল, তাই খেয়ে দিব্যি দিন কেটে যায়। কিন্তু একা একা থাকবে কেমন করে? একটা সংগী সাথী নেই, কার সংগে খেলা করবে, কার সংগে ঝগড়াঝাটি করবে, আর কার সংগেই বা কথা বলবে? এমন করে কি দিন কাটে? ওর বুক ঠেলে কান্না ওঠে। ও একা একা বসে কাঁদে।

একদিন এই রকম কাঁদতে কাঁদতে ওর মনে পড়ে গেল নেকড়ে-মার কথা। যখন তার কাছে ছিল, কি সুখেই না ছিল।

সে তাকে কি ভালই না বাসত। কোন কিছু নিয়ে একটু কান্নাকাটি করলে কত রকম আদর করে কান্না থামাতো। কেনই বা সে তাকে ছেড়ে চলে এল? কে জানে তার নেকড়ে-মা হয়তো তার জন্য কত কান্না কাঁদছে, আবার কি তার কাছে ফিরে যাওয়া যায় না? হোকনা নেকড়ে, তবু এই বানরদের চেয়ে কত ভাল সে। এই ভাবনা তাকে পেয়ে বসল

শেষে সত্যসত্যই একদিন সে তার নেকড়ে-মার খোঁজে চলল। কতদিন হয়ে গেছে, তাই বা কে জানে। কে জানে সেই মা এখন বেঁচে আছে কিনা। যদি বেঁচে থেকেও থাকে তবে সেই গর্তেই আছে না কোথায় গেছে, তাই বা কে বলবে।

কিন্তু নেকড়ে বেঁচেই ছিল, আর সেই গর্তেই ছিল। তাকে খুঁজে বার করতে দেরী হোল না। গর্তের মধ্যে ঢুকেই সে দেখে, ওমা, একি, মা শুয়ে আছে, আর চার চারটি বাচ্চা। এতগুলো বাচ্চা কেন? দেখে তার একটুও ভাল লাগলনা না। এমন যে হতে পারে এ কথা সে-ভাবতেই পারে নি। তার বড় অস্বোয়াস্তি লাগতে লাগল। তবু সে ভয়ে ভয়ে ডাকল, মা, ওমা।

বাচ্চাগুলি তাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে কুঁই কুঁই করে উঠল। নেকড়ে শুয়ে শুয়ে ওদের দুধ দিচ্ছিল। ওকে দেখতে পেয়ে সে লাফ দিয়ে উঠে গোঁ গোঁ করতে লাগল। তার ঠোঁটের তলা দিয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে, চোখ দুটোতে যেন আগুন জ্বলছে, আর মুখটা কি বিচ্ছিরি হয়ে গেছে দেখতে। বানর-বাচ্চার প্রাণ ভয়ে কেঁপে উঠল। এমন তো সে কোনদিন দেখেনি। সে ডেকে বলল, চিনতে পারছ না? আমি মা আমি।

কিন্তু বানর বাচ্চা যে কত বড় হয়ে গেছে। তার চলা-ফেরায় ভাবে ভংগীতে একেবারে আসল বানর। নেকড়ে তাকে কি করে চিনবে? সে হাঁ করে তাকে তাড়া করে এল। ধরতে পারলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

বানর বাচ্চা বুঝল মা আর মা নেই, সে রাক্ষসী হয়ে গেছে। কিন্তু বসে ভাববার সময় ছিল না। সে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে গর্ত থেকে বাইরে এসে একটা ঝোপের মধ্য দিয়ে সড় সড় করে গাছের আগায় উঠে বসল। নেকড়ে এদিকে ওদিকে কোথাও তাকে খুঁজে না পেয়ে আবার গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

একটা ডালে হেলান দিয়ে বসে বানর বাচ্চাটা হাঁপাতে লাগল। সে ভাবছিল, এ সমস্ত কি ব্যাপার? নেকড়ে-মা তাকে চিনল না কেন? এ সংসারে আপন বলতে তার তবে আর কেউ রইল না। সে এখন কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে? ওর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আহাম্মকের দেশে

ধোপা আর নাপিত। দুই বন্ধু চলল বাণিজ্য করতে। বাণিজ্য করে সওদাগরেরা, ধোপা নাপিত বাণিজ্যের কি জানে? এমন কথা কেউ জন্মেও শোনেনি। যে শোনে হাসে। কিন্তু যেই যত হাসুক, কেউ ওদের ঠেকাতে পারল না। ওরা বাণিজ্য করবেই।

আর বাণিজ্য না করে কি করবেই বা বল। ধোপার হাতে জোর বেশী, সে যে কাপড় ধরে আছাড় মারে, সেই কাপড়ই ছিঁড়ে যায়। নাপিতের ক্ষুরে তেজ বেশী, যে গালে টান মারে সেই গালেই রক্তারক্তি কাণ্ড। এই ভাবে দিন যায়। কিন্তু ক'দিন এই ভাবে চলে? গ্রামের লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কত কাপড় খোয়ানো যায়, আর কত রক্ত ঝরানো যায়! একদিন গ্রামের লোক সবাই একত্র হয়ে তাদের জানিয়ে দিল, যা হয়েছে ঢের হয়েছে, এবার তোমরা ক্ষেমা দাও। এই বলে তারা অন্য ধোপা আর অন্য নাপিতের সংগে বন্দোবস্ত করল।

তা যেন করল, কিন্তু এ বেচারারা খায় কি? এদের বাপদাদা চোদ্দপুরুষ যে এই পেশা নিয়েই কামাই করে এসেছে। ফলে জমি নেই, জমা নেই, চাষবাসের কাজও তারা জানে না। এখন কি দিয়ে কি করে? তারা আর কোন উপায় না দেখে গ্রামের লোকদের ধরে পড়ল, তোমরা তো আমাদের কাজ বন্ধ করে দিলে। এখন অন্য কোন কাজ দাও, নইলে আমাদের চলবে কি করে?

গ্রামের লোক বলল, যারা বাপদাদার আমলের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে পারে না, তারা আবার করবে কি? তোমরা কোন কাজের লায়েক নও। তোমাদের যে কাজ দেব, তোমরা সেই কাজই ভণ্ডুল করবে।

ওরা বলল, এ তোমাদের কোন বিচার? বউ আর কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তবে কি আমরা না খেয়ে মরব নাকি? গ্রামের লোকের মেজাজ তিরিক্ষি হয়েছিল। তারা সোজা জবাব দিল, আমরা তার কি জানি? তোমরা যা খুশী করোগে।

অবস্থা বেগতিক দেখে দুই বন্ধু পরামর্শ করতে বসল। তারা কিন্তু যাই করুক, এক সংগেই করবে। কথা হচ্ছে, কি করা যায়?

নাপিত বলল, বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। চল যাই বাণিজ্যই করি।

কিন্তু ধোপা ভরসা পায় না, সে তো ঠিক কথা। কিন্তু বাণিজ্যের আমরা কি জানি?

আরে ভাই, আমরা কোন কাজই বা জানি? যে কাজই করি না কেন, নতুন করেই শুরু করতে হবে। তাহলে বাণিজ্য দিয়ে শুরু করতেই বা আপত্তিটা কি?

না আপত্তি আর কি। তবে দশপুরুষের কাজই যারা করতে পারল না, তারা বাণিজ্য কেমন করে করবে?

বাঃ এও কি একটা কথা হোল নাকি? আচ্ছা, যারা বাণিজ্য করে তারা ধোপা নাপিতের কাজ জানে?

না, তা অবশ্য জানে না।

তবে ধোপা নাপিতের কাজে খাটো আছি বলে আমরাই বাণিজ্য করতে পারব না কেন? বাণিজ্য হচ্ছে বুদ্ধির খেলা।

ধোপার মনে হোল যুক্তিটা বোধ হয় ঠিকই। নাপিত বন্ধুর উপরে তার পুরোপুরি বিশ্বাস আছে।

তাই সে বলল, আমি তো চিরদিনই তোমার সংগে একমত। তুমি যা কর, আমি তাতেই রাজী।

তাই ঠিক হয়ে গেল। বাণিজ্যই করতে হবে। কত লোক হাসল, যত লোক টিটকারী দিল। কিন্তু তারা ওসব গায়ে মাখল না। একটু সাহায্য করবার বেলায় কেউ নেই, কিন্তু হাসতে সবাই পারে। ওরা ওদের সামান্য বিষয়-আশয় যেটুকু ছিল, তা বিক্রী করে বউদের

হাতে কিছু দিল, আর বাকী সামান্য কিছু পুঁজি হিসাবে নিজেদের হাতে রাখল। অবশেষে একদিন শুভদিন দেখে তারা যাত্রা করল।

ওরা দেশ ছেড়ে আর কখনও প্রবাসে যায়নি। যেতে যেতে যেতে যেতে কত রকম দেশ আর কত রকমের মানুষই যে তারা দেখল! যতই দেখে ততই অবাক হয়ে যায়। এ সমস্ত দেশের কথা তারা কোনদিন কালেও শোনেনি। এই ভাবে চলতে চলতে সাত মাস সাত দিন বাদে তারা 'আহাম্মকের দেশে' এসে পৌঁছলো। আহাম্মকের দেশ অবশ্য সে দেশের নাম নয়। সে দেশের নাম সত্যনগর। সেখানকার লোক কেউ মিথ্যে কথা বলতে পারে না। তাই সবাই সবার কথা বিশ্বাস করে। এ দেশের খবর খুব কম লোকেই রাখে। বাইরে থেকে যে সামান্য ক'টি লোক এখানে এসেছে, সেই বিদেশী লোকগুলি কিন্তু মহা আনন্দে আছে। তারা সত্যের ধারও ধারে না। কিন্তু এখানকার লোকেরা সকলেই এমন সাধাসিদে আর সরল যে তাদের মিথ্যে কথা আর ফাঁকিবাজি একেবারেই ধরতে পারে না। আর সেই সুযোগ নিয়ে ওরা এদের মাথায় কাঁঠাল ভেংগে খাচ্ছে। আর এই জন্যেই ওই সমস্ত বিদেশী লোকেরা এই দেশের নাম দিয়েছে, 'আহাম্মকের দেশ।'

এ দেশের হালচাল দেখে নাপিত বলল, আর নয়, এই খানেই আমাদের থামতে হবে। বাণিজ্য করবার মত এমন ভাল জায়গা আর মিলবে না। কথাটা সত্যিই, এ দেশের লোকগুলো যেন ঠকবার জন্যই তৈরী হয়ে বসে আছে। একবার ছুঁচ হয়ে ঢুকতে পারলে, ফাল হয়ে বেরিয়ে আসতে সময় লাগবে না। ধোপা আর নাপিত চুটিয়ে ব্যবসা করতে লাগল। ধোপা প্রথম প্রথম একটু খুঁত খুঁত করত, ধর্মে কি এতটা সইবে? কিন্তু নাপিত তাকে বোঝাল, ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা। যে কাজের যেই ধারা। ব্যবসা করতে গেলে এ সমস্ত করতেই হয়। আর ব্যবসা বাণিজ্য না থাকলে পৃথিবী অচল। কাজেই ভগবান এতে নারাজ হন না।

কিছু দিন যেতে না যেতেই ব্যবসাটা বেশ কেঁপে উঠল। ধোপাও খুব তাড়াতাড়িই নাপিত বন্ধুর কথার মর্মটা বুঝতে পারল। তার মনেও আর কোন খুঁতখুঁতি নেই। লোভের ঠ্যালা এমন ঠ্যালা, এ ঠ্যালা লাগলে আর সব কথাই ভুলিয়ে দেয়।

মাত্র পাঁচ বছরেই তারা ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে উঠল। এ দিকে এই পাঁচ বছরে দেশের অবস্থাটাও বদলে আসছে। লোকগুলোর চোখ যেন একটু একটু করে ফুটে উঠল। তারা কথায় কথায় গোলমাল বাধাতে চায়। নাপিত সত্য সত্যই চালাক। সে লক্ষণ দেখেই বুঝতে পারল, অবস্থাটা যেন একটু ঘোরালো হয়ে আসছে। নাপিত খুব চটপটে, সংগে সংগেই স্থির করে ফেলল, আর এখানে এক মুহূর্ত থাকা নয়। ধোপা একটু আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নাপিতের কথাই মেনে নিল।

পাঁচ বছর পর ওরা ওদের গ্রামে ফিরল। গ্রামের লোক দেখে শুনে থ' খেয়ে গেল এ যে আংগুল ফুলে কলাগাছ! এমন কথা কেউ বা ভাবতে পেরে ছিল? ওরা জায়গা জমি কিনল, আর জমকালো বাড়ী সাজিয়ে বসল। এ যেন যাদুর খেলা। শুধু গ্রাম নয়, সমস্ত অঞ্চল জুড়ে তাদের নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

গ্রামের সবাই এখন বিপদে আপদে তাদের কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়ে। গ্রামের পাঁচজন এসে অনুনয় বিনয় করে। বলে, পুরানো দিনের কথা ভুলে যান। যা অন্যায় করেছি আমরা, সে আর বলবার নয়।

নাপিত বলে, না না কিছুই অন্যায় করেন নি। সে দিন আমাদের এমন করে গাঁ ছাড়া করে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো আমরা এত বড় হয়ে উঠতে পেরেছি। তা না হলে আজও তো সেই দশজনের শাপশাপান্তের মধ্যে থাকতাম।

পাঁচজন কিছুটা ঘাবড়ে যায়। তারা মনে মনে ভাবে এ সব কথা রাগ করে বলছে না তো? কথার মানে বুঝে ওঠা ভার।

ওদের টাকার অভাব ছিল না। তা ছাড়া এখানে সেখানেও ওরা জোরে সোরে ব্যবসা চালিয়ে দিয়েছিল। কাজেই টাকা দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। এত টাকা দিয়ে কি করবে? শেষে ওরা নানা ভাল কাজে টাকা পয়সা দান করতে লাগল। ফলে শুধু তাদের গ্রামেই নয়, সমস্ত অঞ্চল জুড়ে তাদের নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

টাকার গন্ধ পেয়ে দলে দলে লোক তাদের কাছে চাঁদার জন্য আসতে লাগল। তারাও মোটামুটি সবাইকে সন্তুষ্ট রাখত। ফলে তাদের নাম ক্রমশই চার দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

একদিন ধোপা নাপিতের কাছে এসে একেবারে হাত পা ছেড়ে বসল। বলল, ভাই আর তো বাঁচি না। কি যে উপায় করি!

কেন, কি হয়েছে?

আমাকে কি একটা সভার সভাপতি হতে বলেছে। আচ্ছা, সভাসমিতির আমি কি বুঝি? কত করে বললাম, কিছুতেই শুনতে চায় না। বলে, আমার মত উপযুক্ত লোক নাকি এদেশে কেউ নেই। অনেক বলে-কয়েও বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না। ওরা কোন কথাই শুনতে চায় না।

আর সে কথা বল কেন? আমি যে পড়েছি তোমার চেয়েও বিপদে। আমাকে বলে স্কুলের সেক্রেটারী হতে। আচ্ছা, আমি লেখা জানিনা, পড়া জানিনা, লেখাপড়ার আমি কি বুঝি? ওরা বলে কি জান? বলে, আপনারা দেশের গৌরব, লেখাপড়া জানুন আর নাই জানুন, আপনাকেই সেক্রেটারী হতে হবে।

এক আহাম্মকের দেশে পাঁচ বছর থেকে এলাম, কিন্তু সেখানে তো এ উপদ্রব ছিল না। এখানে এসে দেখি বিপদে পড়ে গেছি।

নাপিত বলল, আমিও সেই কথাই ভাবি। যতই দেখছি, ততই মনে হচ্ছে এ দেশটা বোধ হয় ওর চেয়েও বড় আহাম্মকের দেশ।

মুরগীর ছানা

মুরগী তার বাচ্চাকে ডেকে বলল, এই ছোঁড়া, অমন করে খোঁড়াচ্ছিস্ কেন রে।

বাচ্চা বলল, একটা কাঁটা ফুটেছে মা।

কেন, দেখে পথ হাঁটতে পার না? কেবল দস্যিপনা!

হ্যাঁ দস্যিপনা! কাঁটাগুলি কেমন চোরের মত লুকিয়ে থাকে, আর দেখ্ না দেখ্ কুটুস করে ফুটে বসে। ওদের দেখা যায় নাকি? বাচ্চা নাকী সুরে বলল।

না দেখা যায় না! কই, আমাদের পায়ে তো ফোটে না।

বাচ্চা এবার সুযোগ পেয়ে মাকে চেপে ধরল, তোমাকে ক'দিন বলেছি মা, আমি চোখে ভাল দেখতে পাই না, আমাকে একটা চশমা এনে দাও। তা তুমি কিছুতেই দেবে না।

আহা-হা, কি কথার ছিরি! মুরগীরা আবার চশমা পরে কোন দিন?

তবে ওরা পরে কেন? ওই যে ওবাড়ীর ছোট্ট বাচ্চাটা, তার চোখেও এই এত্তো বড় একটা চশমা। আঃ কি সুন্দর দেখতে! কেন, আমায় তুমি একটা দিতে পার না?

মা বলল, হারে পাগলা, ও যে মানুষের বাচ্চা। ওরা তো পরবেই। আর আমরা হচ্ছি মুরগী, আজ আছি কাল নেই। কথায় বলে মুরগীর প্রাণ। ওদের যখন খুশী হবে সাবাড় করে দেবে। আমাদের আবার চশমা! তোর কথা শুনে হাসব না কাঁদব!

কথাটা বলে ফেলেই মুরগী জিভ কাটল। ছি ছি এইটুকুন বাচ্চার কাছে কথাটা বলা ঠিক হয় নি। আছে নিশ্চিন্তে,

থাকুক, যে ক'টাদিন না জানে ভাল। আগে থেকে শুনিয়ে লাভ কি?

বাচ্চাটা বাচ্চা হলে কি হয়, বিষম টনটনে। একটা কথাও ওর কান এড়ায় না! কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে, চশমা না থাকলে কি হবে, সবই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। মা ভাবে, আহা অবোধ শিশু, কিছুই বোঝে না। কিন্তু সে এরই মধ্যে অনেক কিছুই জেনে নিয়েছে। সাবাড় করা কাকে বলে, পুরাপুরি না বুঝলেও কিছু কিছু সে বুঝল। একদিন একটা মোরগকে ওরা কেটেছিল। উঃ কি তার চেঁচানি! তারপর কতক্ষণ ঝটপট করে মোরগটা সেই যে পড়ে রইল, আর উঠল না। বাচ্চা পিট্ পিট্ করে সব কিছুই দেখছিল। তার বিষম ভয় করছিল। তার পর ক'দিন সে আর ঠিকমত ঘুমোতে পারে নি। এর নামই বোধ হয় সাবাড় করে দেওয়া।

মুরগীকে ডিভ্ কাটতে দেখেই বাচ্চা বুঝল মা যেন কি কথা বলতে গিয়েও চেপে গেল। ব্যস্ আর তাকে পায় কে, কারা সাবাড় করে, কেমন করে সাবাড় করে আর কেনই বা সাবাড় করে? উহুঁ, না বললে কিছুতেই ছাড়বে না সে! কি ছেলে বাবা, মায়ের কানের পোকা একেবারে খসিয়ে ছাড়ল।

একটু একটু করে বাচ্চাটা কথা আদায় করে নিল। বলব না, বলব না, করতে করতেও মাকে কিছু কিছু বলতেই হোল। একবার একটু বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে আর কি উপায় আছে! বাচ্চা আগে যা জানত আর এখন মার মুখে যা শুনল, দুটোতে যোগ করে নিয়ে মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝল। আগে মনে করেছিল, ওই মোরগটা বুঝি তার নিজের কপাল-দোষে অমন করে সাবাড় হয়ে গেল। আর এখন বুঝল, কপাল টপাল কিছু নয়। মোরগ-মুরগী যত আছে, সবারই এই একই দশা ঘটবে। দুদিন আগে আর পরে। তার মানে, সে আর

তার মা, তারাও এ থেকে বাদ যাবে না। কি সর্বনেশে কথা। এমন কথাতো সে কোনদিনই ভাবতে পারে নি।

চিন্তাটা ভারী হয়ে তার মাথার মধ্যে ঝুলতে লাগল। এক মুহূর্ত রেহাই দেয় না। এই একই কথা কত রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে তার মার কাছে শুধোতে লাগল। মা বলল, রাখ বাছা, এসব কথা অত বেশী ভাবতে নেই। ভাবতে গেলেই জ্বালা। অদেষ্টে যা আছে, তাই হবে।

হুঁঃ, মার যেমন কথা! 'ভাবতে নেই' বললেই কি আর না ভেবে থাকা যায়? তার খেতেও ভাল লাগে না, শুতেও ভাল লাগে না। কিছু ভাল লাগে না। একদম চুপ মেরে থাকে। এমন ঠাণ্ডা স্বভাব আর তার কখনও দেখা যায় নি। মা বলে, হ্যাঁরে তোর হোল কি? অসুখ বিসুখ করেনি তো?

সুখ আর কোথায় আছে? বাচ্চা জিগ্যেস করল, আচ্ছা মা, যখন ওরা আমাদের সাবাড় করে, তখন খুব ব্যথা পাওয়া যায় না? তখন সবাই বুঝি খুব চ্যাচায়, না গো? আমরা তো পায়ের তলায় একটু কাঁটা ফুটলেই বিষম ব্যথা পাই।

হা আমার কপাল! এখনও তুই সেই কথাই ভাবছিস্?

না, মা, বল না।

ব্যথা? ব্যথা কি না পেয়ে পারে?

বাচ্চা কি তা বোঝে না? ভাল করেই বোঝে, তবু জিগ্যেস করে, আচ্ছা মা, আমরা যখন ব্যথা পেয়ে চেঁচাই, ওদের মনে একটু দুঃখ লাগে না?

দূর পাগল, মুরগী ব্যথা পেলে ওদের কি? ওদের দুঃখ লাগবে কেন?

তবে ওরা অত আদর করে আমাদের খাওয়ায় কেন?

মুরগীর মুখ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, খাইয়ে দাইয়ে আমাদের মোটা তাজা না করলে ওরা পেট ভরে গোশ্‌ত খাবে কি করে?

কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েও সে কোন মতে সামলে নিল।

মুরগী চেয়ে দেখল, ভেবে ভেবে ছেলেটা যেন একেবারে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করেছে সে। কেনই বা সে ওসব কথা তুলতে গেল! ভাবল, দেখা যাক, ছেলেটার মনটা একটু অন্যদিকে ঘুরানো যায় কিনা।

সে মাথা নাচাতে নাচাতে বলল, হ্যাঁরে ছেলে, তুই পোকা মাকড় খাসনা?

হ্যাঁ খাই, খুব খাই।

কেন খাস?

বারে, খাওয়ার জিনিস খাব না? সৃষ্টিকর্তা তো আমাদের খাওয়ার জন্যই ওদের পয়দা করেছিল।

মুরগী একটু হেসে বলল, ওরাও তো এই কথাই বলে। বলে, মোরগ মুরগীরা নাকি ওদের খাওয়ার জন্যই পয়দা হয়েছিল।

বাচ্চা এবার একটু বিপদেই পড়ে গেল। তবু সে বলল, ওরা মিথ্যে কথা বলে, না মা?

কি জানি বাছা।

মাও এই কথা ঠিকমত জানে না। তবে?

কিন্তু আমরা যে ব্যথা পাই?

পোকামাকড়ও তো ব্যথা পায়?

বাচ্চা মায়ের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল? মা আবার একি কথা বলছে!

দূর, এতটুকুন্ পোকামাকড়, ওদের আবার ব্যথা-বেদনা কি? এক কামড়েই শেষ।

মুরগী বলল, আরে বোকা, আমরাও তো মানুষের কাছে এই টুকুনই। সেই জন্যই তো ওরা আমাদের দুঃখু বোঝে না।

মুরগীর বাচ্চা এরপর আর কি বলবে। এত বড় বক্তা, কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না।

টেপীর কাণ্ড

সবাই এক রকম জিনিস খেতে ভালবাসে না। এক একজনের এক এক রকম পছন্দ। কেউ ভালবাসে মিষ্টি, কেউ টক, কেউ নোনতা, কেউ ঝাল, এমনকি এমন লোকও আছে যারা তেতো খেতে ভালবাসে।

টেপী ভালবাসে কাঁচা চাল খেতে। ভাত দাও, ডাল দাও, তরকারী দাও, মাছ মাংস দাও, পিঠে পায়েস দাও, কোনটাতেই আপত্তি নেই, সবই সে খাবে। কিন্তু কাঁচা চাল খেতে তার যত আনন্দ এমন আনন্দ আর কিছুতে নেই। টেপী কে? মুকুলদের বাড়ীর কুকুরটা। মুকুলের কাকা ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। তখন ছিল এইটুকুন বাচ্চা। শুধু হাড্ডি আর চামড়া। অমন কুকুর কেউ আদর করে পোষে না। কিন্তু মুকুলের কাকার কেমন যেন মায়া বসে গেল। রাস্তা থেকে ওকে কোলে করে নিয়ে এল।

মুকুলের মা বলল, ছি-ছি-ছি, এটাকে আবার কোত্থেকে নিয়ে এলে?

মুকুলের কাকা বলল, ওকে পুষব বউদি।

আহা, কিনা কুকুরের ছিরি! পুষবে ওকে। আর রাজো তুমি কুকুর পেলে না!

না-না বউদি তুমি কিছু বোলো না। খেতে পায়নি কিনা, তাই এমন হয়েছে। তুমি দেখো, খেতে পেলেই তাজা আর সুন্দর হয়ে উঠবে। জানো বৌদি, বাজার থেকে আসবার পথে দীঘলি ভিটার ধারে দেখি দু'তিনটা কাকে ওকে চিৎ করে ফেলে ঠোকরাচ্ছে। মেরেই ফেলত। তখন কি আর ফেলে আসা যায়।

মুকুলের মা বলল, ছেড়ে ফেলত, আপদ চুকত। তোমার যত কাণ্ড। এক একবার এক একটা জঞ্জাল জুটিয়ে নিয়ে আসো, তাও যদি একটু দেখতে সুন্দর হোত।

যে যাই বলুক টেপী কিন্তু থেকেই গেল। শুধু থাকা নয় খেয়ে খেয়ে ধিবিা বড়সড় হয়ে উঠল। মুকুলের কাকা বলল, কেমন বৌদি, বলেছিলাম না। একবার তাকিয়ে দেখ দেখি।

মুকুলের মা ধংকার দিয়ে উঠল, আমার আর তাকিয়ে কাজ নেই। এমন খাওয়া পেলে বড় হয়ে তো উঠবেই। কিন্তু ওটাকে খাইয়ে কোন্ লাভ? শোন তবে ওর গুণের কথা। সন্ধ্যার পরে শেয়ালগুলো যখন ডাকে, পাড়ার আর কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে উঠে তাড়া করে যায়। আর তোমার টেপী কি করে জান? ভয়ে জড়সড় হয়ে লেজ গুটিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে চায়। এমন কুকুর কেউ দেখেছে?

টেপীর নিন্দা শুনে মুকুলের কাকার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তবু সে বোঝাতে চেষ্টা করল, আর একটু বড় হোক, ভয় কেটে যাবে।

মুকুলের মা উত্তর দিল, বড় হতে কিছু এখনও বাকী আছে। আর বড় হবে কবে?

এইভাবে দিন যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ টেপীটার স্বভাব খারাপ হয়ে গেল। ফলে বাড়ীর সবাই তার উপর বিষম চটে গেল। মুকুলের কাকা আর ওকে কোনমতেই সামলে রাখতে পারে না।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই। মুকুলের বাবার চালের দোকান আছে। বাড়ীতেই একটা ঘরে বস্তায় বস্তায় চাল মজুত থাকে। পাড়ার লোক, গাঁয়ের লোক এখান থেকে চাল কিনে নিয়ে যায়। টেপী আগে জানত না, হঠাৎ একদিন টের পেয়ে গেল, সংসারে যত ভাল ভাল খাবার জিনিস আছে, কাঁচা চালের মত কোনটাই নয়। যেই না বোঝা, আর দেরী নেই, চুরী করে করে চাল খেতে শুরু করল।

অতগুলো বস্তা, প্রথমে টের পাওয়া যায় নি। কিন্তু ক'দিন আর চাপা থাকে? দু একদিনের মধ্যে ওর বিদ্যে ধরা পড়ে গেল। শুধু যে চাল খায় তাই তো নয়, তার চেয়ে বেশী ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার করে। শুধু কি তাই? নতুন নতুন বস্তাগুলি কেটে কুটিকুটি করছে।

মুকুলের বাবা রেগেমেগে অস্থির। রাগবারই তো কথা। সে বকাঝকা আর চেঁচামেচি করে বাড়ী মাথায় করে তুলল। কিন্তু টেপী কোথায়? ওকি যেমন তেমন পাজী! মুকুলের বাবাকে রাগারাগি করতে দেখলেই সে টুক্ করে একদিকে সরে পড়ত।

মুকুলের মা বলল, নেও এবার ঠ্যালা। আমি কি করব? ও কুকুর কি আমার কথা শোনে? তোমার এত আদরের মেয়ে, দেখ তুমি কিছু করতে পার কি না।

মুকুলের কাকা অনেক করে বোঝাল যে কাজটা খুব অন্যায় হচ্ছে। টেপী কান খাড়া করে ওর সব কথা শুনল। কি বুঝল না বুঝল সেই জানে!

মুকুলের কাকা ওকে আদর করে ভাল ভাল জিনিস খাওয়াল আর তারপর তাকে বার বার করে মানা করে দিল ওসব ছাইমাটি যেন আর না খায়।

টেপী খাবার খেয়ে মনের আনন্দে লেজ নাড়তে লাগল। মুকুলের কাকার মনে হোল তার কথায় অনেকটা কাজ হয়েছে। মনে যেন খুবই লজ্জা পেয়েছে।

কিন্তু তবু একটু সাবধান হওয়া ভাল। মুকুলের কাকা বউদির বড় ট্রাঙ্কের তালাটা খুলে নিয়ে দোকান ঘরের দরজায় লটকে দিয়ে বলল, যাক্ এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে আবার সেই হৈ চৈ। টেপী চোরের মত সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে চাল খেয়ে গিয়েছে। কি সর্বনাশের কথা! এমন চোর নিয়ে বাস করা যায়?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দুটো দিন ভালোয় ভালোয় কাটল। কিন্তু তিন দিনের দিন খাবার নেই। টেপী খাবার চাল চুরি করে খেয়েছে। এর পর থেকে এটাই নিয়ম হয়ে চলতে লাগল। টেপী যারও খেতে লাগল, চালও খেতে লাগল। চাল না খেয়ে কেমন করে পারে সে? চালগুলো যেন তাকে টানতে থাকে। চালের মত জিনিস কি আর সংসারে আছে? যার খেতে ভাল লাগে, চাল না খেয়ে সে পারবে না। টেপী দস্তুরমত পাকা চোর হয়ে উঠল।

দুলুদের মামা বলল, ওটাকে দূর করে দিয়ে আয়, নয়তো আমি ওকে দূর করে দেব।

দুলুদের বাবা বলল, ওকে আর রাখা যাবে না, দূর করেই দিতে হবে। বউদিকে বলল, দুলুটাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসিস বড়ো হয়েছে।

বউদি কোন কথা বলল না।

তুমি কি বলো বউদি?

বউদি এবার বলল, পথ দেখিয়ে দিলেই কি আর পথ ছেড়ে যাবে মনে করো? ও আবার ঠিক চলে আসবে।

না না, আমি ওকে অনেক দূরে দিয়ে আসব। ও আর আসতে পারবে না।

দুলুদের বড় বোন বৈদ্য পাড়ায় তার শ্বশুর বাড়িতে। এখান থেকে মাত্র আধ মাইল হবে। দুলুদের বাবা বলল, কি-রে দুলু, যাবি নাকি বৈদ্যদের বাড়ী?

দুলু নাচিয়ে উঠল, হ্যাঁ বাবা, যাব বাবা।

হ্যাঁ ঠিক পারবি তো?

হ্যাঁ, কেন পারব না? আমি তো অনেক দেখি।

পরদিন সকালে বোন আর দুলু বৈদ্যদের বাড়ী। টেপীও তাদের সঙ্গে চলে। টেপীর সঙ্গেই তো সারা সংসার ঘোরা। টেপীর সঙ্গেই এই কয়েকটা দিন সংসারটাকে ভাল করে চিনল। সে ভাবে

করেছে, এখনই বুঝি আবার সেই পিটুনি শুরু হবে। মুকুলের কাকা খাওয়ার জিনিস দিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করল। টেপী বুঝল মারবার জন্য বাঁধেনি। কিন্তু তবে কিসের জন্য?

ওরা তিন জন হাঁটতে হাঁটতে গাঁ ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে এসে নামল। মুকুলের কাকার হাতে দড়ির আগাটা। টেপী ভাবল, ভালই তো, আমি এই রকম বেড়াতেই তো ভালবাসি। কিন্তু এমন করে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নেবার কি দরকার ছিল? খোলা থাকলে আমি কেমন দৌড়ে দৌড়ে চলতে পারতাম। সে এক মজার খেলা হোত!

হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে তারা শৈলদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছল। গ্রামটা পদ্মানদীর পাড়েই। গ্রামের নাম সানিহাটি। সারাটা রাস্তা একটু বাদে বাদেই টেপী তার গলার দড়িটা খুলে ফেলতে চেয়েছিল।

মুকুলের কাকা ধমক দিয়ে তাকে থামিয়েছে। এতখানি পথ এইভাবে টানাটানি করতে করতে সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শৈলদের গ্রামে এসে পড়তেই মুকুলের কাকা ওর গলার দড়িটা খুলে দিয়ে তাড়া দিয়ে বলল, যা ভাগ!

টেপী কিন্তু ভাগল না। সে দু হাত দূরে দাঁড়িয়ে মুকুলের কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। মুকুলের কাকা ওকে তাড়াবার জন্য ঢিল তুলল। টেপী আর একটু পিছিয়ে গেল, কিন্তু কিছুতেই চলে যাবে না। সে বলতে চাইছিল, তুমি এমন করছ কেন? তোমাদের ছেড়ে আমি কোথায় যাব? এই অজানা দেশে আমি কেমন করে একা একা যাব?

মুকুলের কাকা ওর মনের কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল। কিন্তু কি করবে সে। ওকে যে দূর করে দিতেই হবে। মনটাকে কিছুতেই নরম করলে চলবে না। সে বলল, মুকুল, মুকুল, ওকে ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দে তো।

মুকুল ঢিল ছুঁড়তে খুব ভালবাসে। কাকার আজ্ঞা পেয়ে আর কি কথা আছে, মহা আনন্দে টেপীকে তাক করে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। টেপী অবাক হয়ে গেল, এমন কাণ্ড সে আর কখনও দেখেনি। কিন্তু পর পর কয়েকটা ঢিল গায়ে পড়তেই সে বুঝল এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। সে পিছনে হটল, কিন্তু একেবারে চলে গেল না। একটু দূরে সরে বসে মুকুলের কাকার মুখের দিকে কাতর ভাবে তাকিয়ে সে জানতে চাইছিল, আজ তোমার কি হয়েছে? তুমি তো আগে এমন ছিলে না।

মুকুল বলল, ও কিছুতেই যাবে না কাকা।

মুকুলের কাকা ভাবল, তাই তো এখন কি করা যায়! যদি সব সময় পিছন পিছন চলতে থাকে তবে ওকে পার করবে কি করে?

কিন্তু খুব সহজেই ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেল। টেপীকে দেখতে পেয়ে কোত্থেকে দুটো কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে তাড়া করে এল। বিষম বদ মেজাজী কুকুর দুটো। টেপীর আর রক্ষা নাই। টেপী চিরকালই শান্ত স্বভাবের মেয়ে। ঝগড়া ঝাটি তার ধাতে সয় না। গোলমাল দেখলেই সে লেজগুটিয়ে সরে পড়ে। কুকুর দুটোকে এ ভাবে তাড়া করতে আসতে দেখে তার মাথামুণ্ডু ঘুরে গেল। সে যে দিকে চোখ যায়, সেই দিকে পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগল। টেপীর পায়ে যে এত জোর আছে, মুকুলের কাকার তা জানা ছিল না। দেখতে দেখতে তিনটে কুকুর ওর সামনা থেকে কোথায় মিলিয়ে গেল।

মুকুলের কাকা ভাবতে লাগল, টেপীকে আজ মেরেই ফেলবে। কিন্তু ভেবে আর কি হবে, সে তো ওকে দূর করে দেবার জন্যই নিয়ে এসে ছিল।

টেপীকে কোন মতে বিদায় দিয়ে শেষে ওরা শৈলর শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে উঠল। কাকাকে আর মুকুলকে পেয়ে শৈলর তো

মহা আনন্দ। গল্পে সল্পে দুটো দিন বেশ কেটে গেল। টেপীর কথা ভাববার মত সময় ছিল না।

তিন দিনের দিন ওরা বাড়ীতে রওনা হল। যেখানে টেপীর সংগে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেই জায়গাটায় আসতেই ওদের টেপীর কথা মনে পড়ে গেল।

মুকুল বলল, কাকা, টেপীটা কোথায় গেল?

মুকুলের কাকাও মনে মনে এই কথাই তো ভাবছিল। সে কোন উত্তর দিল না।

মুকুল আবার বলল, কাকা, টেপীটাকে বোধ হয় ওরা কামড়ে মেরে ফেলেছে, না? ওর তো গায়ে জোর নেই বেশী। আর ও দুটো কুকুর তো বাঘের মত।

মুকুলের কাকার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। টেপীকে যে কতখানি ভালবাসত, তা তার আগে জানা ছিল না, এখন বুঝতে পারছে। মুকুল টেপীর সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলল। কিন্তু সে তার কোন কথাতেই সাড়া দিল না।

ওরা যখন বাড়ী এসে পৌঁছল, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। বউদি শৈলর খবরাখবর নিয়ে তারপর জিগ্যেস করল, কি ঠাকুরপো, টেপীটার কি করে এলে?

মুকুলের কাকা মুখ ভার করে বলল, ওকে পার করে দিয়ে এলাম।

আবার ফিরে এসে পড়বে না তো।

মুকুলের কাকা উত্তর দিল, না অদ্দূর থেকে কি আর পথ চিনে আসতে পারবে?

মুকুল বলল, মা মা, সানিহাটির দুটো কুত্তা ওকে কামড়ে মেরে ফেলেছে। তাইনা কাকা?

মুকুলের মা একটু হাসি হাসি মুখে বলল, তাই নাকি? গেছে আপদ গেছে।

মুকুলের কাকা আর মুকুল দুজনের কাছেই কথাটা বড় খারাপ লাগছে। মুকুলের কাকার মন মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। কুকুরটাকে মেরে ফেলেছে শুনে বউদি কি রকম হাসছে! আশ্চর্য মানুষ সব, একটু মায়া মমতা নেই।

বাড়ীতে সবাই আছে, শুধু টেপী নেই। মুকুলের কাকার মনটা হু হু করে উঠল। টেপী কোথায় গেল, বাঁচল না মরল, কোন কথাই আর জানা যাবে না। তাড়িয়ে দেবার সময় ও কেমন করে তার মুখের দিক তাকিয়ে ছিল, সেই কথাটাই বার বার মনে পড়তে লাগল। আর কোন দিন সে ওকে দেখতে পাবে না। কোন দিন না। মুকুলের কাকা খাটটার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

বউদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার ভাবভংগি দেখছিল। সে বলল, বারে, এখন আবার শুয়ে পড়লে কেন? যাও যাও, তোমরা চান করে এসো। তারপর খেয়ে দেয়ে শুয়ো। অনেক পথ হেঁটে এসেছ তো।

বউদির কি-যে হয়েছে। কথা বলছে আর হাসছে। এর মধ্যে হাসবার কি কথা আছে?

মুকুলের কাকা ভাবল, টেপীটা চলে গিয়েছে বলেই বোধ হয় এত খুশী। তাই মজা দেখছে আর হাসছে। মুকুলের কাকার ভিতরে ভিতরে কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু এখন তো আর ছোটটি নেই, কেমন করে কাঁদবে? তবে এ কথাটা সে ভাল করেই বুঝে নিয়েছে, এ সংসারে সবাই তার শত্তুর। বন্ধু বলতে কেউ নেই। এক টেপী ছিল, সেও তো আজ নেই।

বউদি বলল, ওঠো তো এখন। খাওয়া দাওয়া সেরে নাও আগে। বউদি তখনও মুখ টিপে টিপে হাসছে।

মুকুলের কাকা চটেমটে বলে উঠল, যাও আমি খাব না।

ওমা, খাবে না কেন?

মুকুলের কাকা বলল, আমার পেট কামড়াচ্ছে, যাও তুমি যাও। বলেই সে পাশ ফিরে শুলো।

পেট কামড়ানির কথা শুনে বউদি কিন্তু একটুও ঘাবড়াল না, বলল, বেশ তো, পেট কামড়ানি হয়েছে তো কি হয়েছে। পেট কামড়ানির ভাল ওষুধ আমার জানা আছে।

মুকুল কাকার পেট কামড়ানির কথা শুনে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সে বলল, দাওনা মা, কাকাকে সেই ওষুধটা দিয়ে দাও।

তার মা হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ এই যে দিচ্ছি। একেবারে অব্যর্থ ওষুধ।

এই বলেই সে ডাকতে লাগল, টেপী, টেপী, টেপী! আয় আয়, তোর বাপ এসেছে, দেখে যা। মুকুল আর মুকুলের কাকা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

টেপী দুপুর বেলার খাবার খেয়ে পশ্চিমের ঘরের দাওয়ায় আরাম করে ঘুমোচ্ছিল। ডাক শুনে সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

মুকুলের কাকা আর মুকুল দুজনেই চমকে উঠল। মুকুলের কাকা বলল, একি, ও কখন এল, কেমন করে এল?

বউদি বলল, তোমরা যে দিন গেলে না, সেই দিনই ও ফিরে এসেছে। কিন্তু এবার কথা বল শুনি। তোমার পেট কামড়ানিটা সেরে গেছে তো?

মুকুলের কাকা এবার হেসে ফেলল। আর কি না হেসে থাকতে পারে?

আর টেপী? টেপী এসে তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। সে মুখ ঘসে আর ল্যাজ নেড়ে নেড়ে তার মনের আনন্দ জানাতে লাগল।

কিন্তু মুকুলের কাকার মনে হোল, টেপী যেন আরও কিছু বলতে চাইছে। ও যেন বলতে চাইছে, তুমি যাই করনা কেন, সে দিন আমার সংগে তোমার ব্যবহারটা মোটেও ভাল হয়নি।

——